শুকতারা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ • ১৩৮০

রহস্যময় অভিযাত্রী

পাঞ্চালরাজের মেয়ে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা। নিজে তিনি বর পছন্দ করে নেবেন। প্রার্থী অনেক। জতুগৃহ থেকে পলাতক পাণ্ডবেরাও হাজির হলেন সেখানে,—ছদ্মবেশে।

পাঞ্চালরাজের প্রতিজ্ঞা—বিশাল ধনুতে কঠিন লক্ষ্যভেদ করতে পারবে যে তারই হাতে সমর্পণ করবেন মেয়েকে। সবাই বিফল। কর্ণ নাকচ। সফল হলেন ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন।

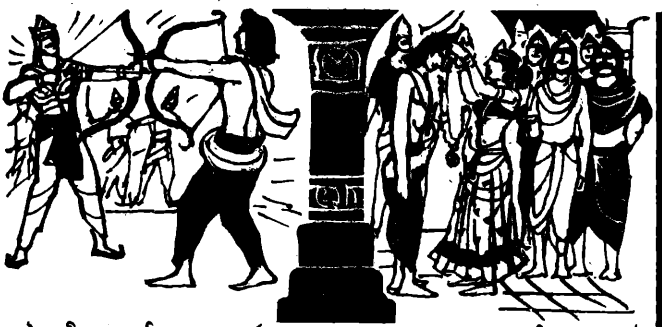

দ্রৌপদী মালা দিলেন অর্জুনের গলায়। অন্যরা ক্ষেপে গিয়ে লড়াই জুড়ে দিলেন। কিন্তু পারবেন কেন? লড়তে গিয়ে কর্ণও বুঝলেন এ-ব্রাহ্মণ সামান্য নন, তাঁকে হার মানানো শক্ত।

পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে ফিরলেন ঘরে। বললেন—মা ভিক্ষে নিয়ে এলাম। না তাকিয়েই মা বললেন—বেশ তো, ভাগ করে নাও! সেজন্যেই দ্রৌপদী পাঁচ ভাইয়ের এক বউ!

অমৃত সমান
মহাভারত-কথা
বোরোলীন
হাউস কর্তৃক প্রচারিত

বোরোলীন
সুরভিত
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক
কিংবা ঝলসানো ত্বকের
অনবদ্য নিরাময়—।

বাঁটুল দি গ্রেট

জ্যৈষ্ঠ—

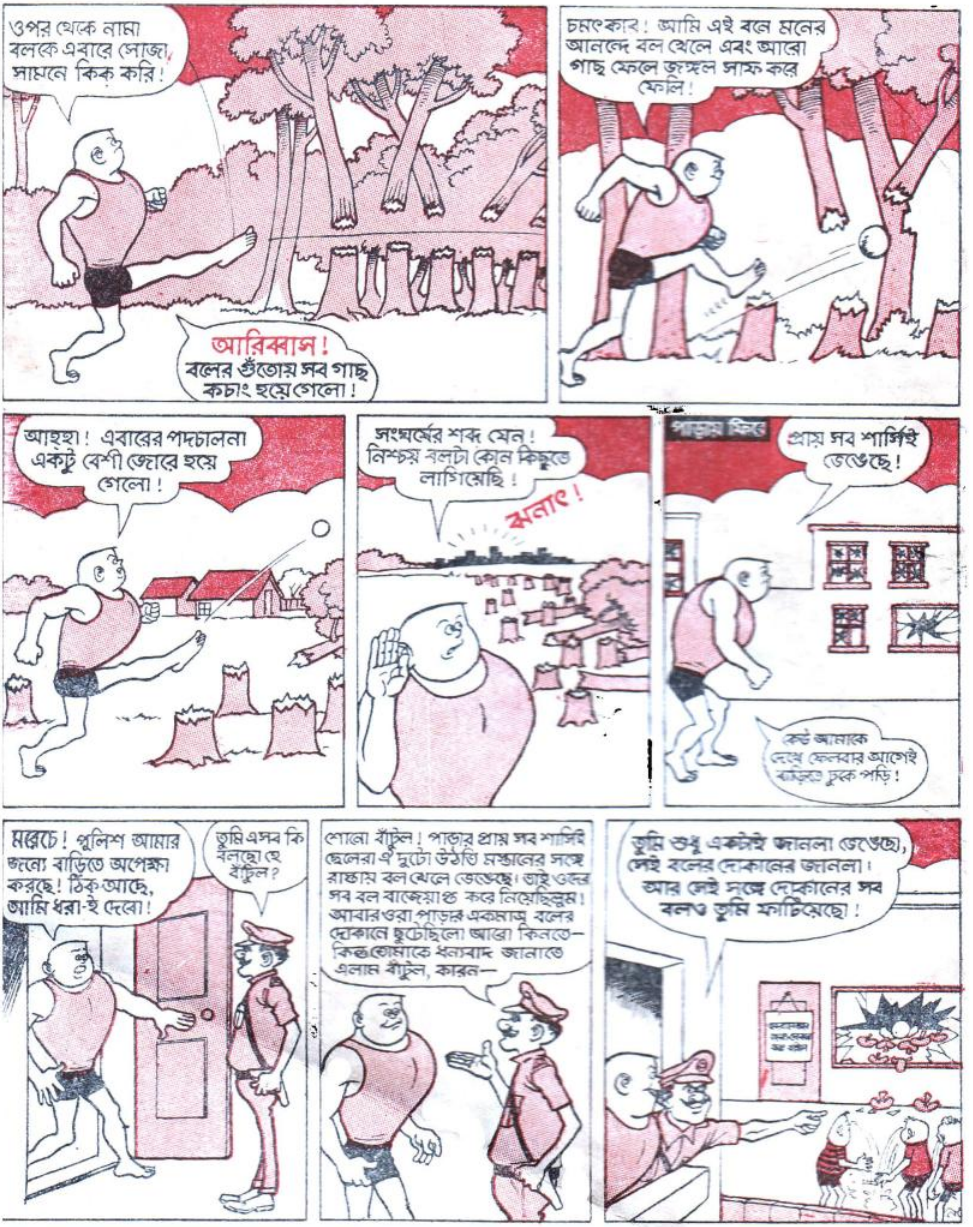
ওপর থেকে নামা বলকে এবারে সোজা সামনে কিক্ করি!
আরিব্বাস! বলের গুঁতোয় সব গাছ কচাং হয়ে গেলো!
চমৎকার! আমি এই বলে মনের আনন্দে বল খেলে এবং আরো গাছ ফেলে জঙ্গল সাফ করে ফেলি!
আহ্হা! এবারের পদচালনা একটু বেশী জোরে হয়ে গেলো!
সংঘর্ষের শব্দ যেন! নিশ্চয় বলটা কোন কিছুতে লাগিয়েছি!
ঝনাৎ!
পাড়ায় ফিরে
প্রায় সব শার্সিই ভেঙেছে!
কর্তা আমাকে দেখে ফেলবার আগেই বাড়িতে ঢুকে পড়ি!
মরেচে! পুলিশ আমার জন্যে বাড়িতে অপেক্ষা করছে! ঠিক আছে, আমি ধরা-ই দেবো!
তুমি এসব কি বলছো হে বাঁটুল?
পোলো বাঁটুল! পাড়ার প্রায় সব শার্সিই ছেলেরা ওঁ দুটো উঠতি মস্তানের সঙ্গে রাস্তায় বল খেলে ভেঙেছে। তাই ওদের সব বল বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলুম। আবারওরা পাড়ার একমাত্র বলের দোকানে ছুটেছিলো আরো কিনতে— কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম বাঁটুল, কারন—
তুমি শুধু একটাই জানলা ভেঙেছো, সেই বলের দোকানের জানলা। আর সেই সঙ্গে দোকানের সব বলও তুমি ফাটিয়েছো!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	রহস্যময় অভিযাত্রী ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রথম ছবি
৩।	লম্বা দাড়ি চৌকিদার (কবিতা) ...	শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৩৩
৪।	পৃথিবীর সবথেকে ধনী উত্তরাধিকারী ...	রিপ্পে ...	২৩৪
৫।	জবর দখল (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	২৩৫
৬।	উৎকলেন্দ্র মুকুন্দ হরিচন্দন (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	২৪৪
৭।	অদৃশ্য শত্রুর যম (জানবার কথা) ...	— ...	২৫৩
৮।	সোনা ও রূপা (ছবিতে গল্প) ...	দিলীপ দাস ...	২৫৪
৯।	ভগোয়া পল্‌টন (শহীদ স্মৃতিকথা) ...	রঞ্জন মিত্র ...	২৫৮
১০।	মজার ছবি (ছড়া) ...	— ...	২৬৩
১১।	জীবন-মৃত্যুর লটারি (বিজ্ঞান) ...	শ্রীবৈজ্ঞানিক ...	২৬৪
১২।	অস্কার হ্যামারষ্টেইন (জীবন-কথা) ...	শৈলেশ ভড় ...	২৭৩
১৩।	রাজনীতির চেয়ে সুখে থাকা ভাল (জানবার কথা)	— ...	২৭৬
১৪।	সোনার ঘণ্টা (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	অনিল ভৌমিক ...	২৭৭
১৫।	হাঁদা-ভোঁদার বুদ্ধি খাটানো (ছবিতে গল্প) ...	— ...	২৮৪
১৬।	জাবাল্‌জা ও টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ...	২৮৬
১৭।	ডলার আসছে (জানবার কথা) ...	— ...	২৯৪
১৮।	ফেঁসে গেলেন ঢেঁকিদা (গল্প) ...	প্রবুদ্ধ ...	২৯৫
১৯।	"৺মণিধর স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)	— ...	৩০০
২০।	ভক্তের ভগবান (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	কল্যাণকুমার আচার্য ...	৩০১
২১।	অবতার (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	শ্রীনির্মলেন্দু নাথ ...	৩০৩
২২।	আগুন থামাতে ও জ্বালাতে অগ্নিবাহিনী (জানবার কথা) ...	— ...	৩০৬
২৩।	তাচ্ছিল্য করা উচিত নয় (জানবার কথা) ...	— ...	৩০৬
২৪।	ইচ্ছার ফল ...	রিপ্পে ...	৩০৭
২৫।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)	— ...	৩০৮

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৮০ পয়সা

NEW!
SUPER
Surf
FOR SUPER WHITENESS
সুপার সার্ফ দিয়ে একবার ধুলেই
অন্য যে কোনও পাউডারে
ধোয়ার চেয়ে জামাকাপড়
অনেক বেশী ফর্সা হয়
সুপার সার্ফ
সবচেয়ে সাদা কারে ধোয়
(নীল বা সাদা করবার কিছুই মেশাতে হয় না)
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিনটাস-SU.117-77 BG

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৮০, জ্যৈষ্ঠ

লম্বা দাড়ি চৌকিদার

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

লম্বা দাড়ি চৌকিদার
পেস্তা খাওয়া পালোয়ান
গিলতো বরফ শীতের রাতে
গ্রীষ্মে নিতো আলোয়ান।

দুপুর রোদে ঘামতো না
তালপুকুরে নামতো না
সন্ধ্যে বেলায় দেখতো ভালো
বলতো দিনে—"আলো আন!"
পেস্তা খাওয়া পালোয়ান।

পাট্টা ভারী চৌকিদার
হাঁক ছিল যে জবর তার
ফড়িং এলে বলতো হেঁকে
"হেই সামালো খবরদার ;"
ছাগল দেখেই কাঁপতো সে
দাড়ির বহর মাপতো সে।
হুক্কাহুয়ার হল্লা শুনে
বলতো-"বহুৎ ভালো গান !!"
পেস্তা খাওয়া পালোয়ান !!

পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে ধনী উত্তরাধিকারী

রিপ্লে

টাকাটা শেষ অবধি পেয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি, কিন্তু পাওনা হয়েছিল ফরাসী কাউণ্টেস এলিজাবেথ অ্যাঙ্গলিক দ্য কেটেভিলের। যদি তিনি সে টাকা পেতেন তার পরিমাণ আজ যুক্তরাষ্ট্রে যত টাকা আছে তার সব অঙ্ককে ছাড়িয়ে যেত। টাকাটা পাওনা হয়েছিল তাঁর স্বামীর সম্পত্তি থেকে। তাঁর স্বামী ছিলেন সেনলিম রাষ্ট্রপাল। স্বামী যখন মারা যান তখন এলিজাবেথের বয়স সবে কুড়ি। স্বামী একটা উইল করে গেছলেন। উইলে লেখা ছিল যতদিন তাঁর স্ত্রী পুনর্বিবাহ না করবে ততদিন স্ত্রী তাঁর সম্পত্তি থেকে প্রথম বছরে পাঁচ, দ্বিতীয় বছরে দশ, তৃতীয় বছর কুড়ি এই বৃদ্ধি হারে ডলার স্বর্ণমুদ্রা পাবে। এলিজাবেথ আর বিয়ে করেন নি। ৬৯ বছর পুনর্বিবাহ না করেই কাটিয়ে দেন। ফলে তাঁর পাওনা হয়েছিল সবসুদ্ধ ১৪৭,৫৭৩,৯৫২,৩১৪,৭৭৪,৫০৬,১১২ স্বর্ণমুদ্রা।

নালিশ করলে এলিজাবেথ ডিগ্রী পেতেন নিশ্চয়, কিন্তু নালিশ করার খরচ দিতে পারতেন কিনা ভাববার বিষয়।

ঘটনাটা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের।

বিদেশী গল্প

জবর দখল

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ঘণ্টা বেজে উঠল বসবার ঘরে।

ওঘরে যিনি মোতায়েন থাকেন রোগীদের অভ্যর্থনার জন্য, আজ তাঁর ছুটির দিন। কাজেই কথা কইবার জন্য স্বয়ং ডাক্তার ক্লেইনকেই যেতে হবে ওখানে। একটু খুচরো কাজে টম মার্সারকে পাঠিয়েছিলেন সেই কখন! মানে ঐ চাকরটাকে। তা ফাঁকিবাজ লোকটার ফিরবার নাম নেই এখনো। গায়ে গতরে হাতীর তাগদ থাকলে কী হবে, কাজে ও কুঁড়ে।

যেতে হচ্ছে খোদ ডাক্তারকেই। অথচ পরিস্রুত জলের বোতলটা এই সবে বসানো হয়েছিল পিপের নীচে, জল না ভরেই বা তিনি যান কী করে? এক কাজ করতে করতে অন্য কাজে ছুটে যাওয়া খুব অপছন্দ ক্লেইনের। করুক রোগী দুই মিনিট অপেক্ষা। উপায় কী! কাজের কেতা নষ্ট করতে রাজী নন তিনি।

অবশেষে বোতল ভর্তি হল, পিপের নল বন্ধ করে বোতল তাকের উপর তুললেন ডাক্তার। একটা কবজাওয়ালা চ্যাপ্টা চামচ ভাঁজ করে পকেটে পুরলেন প্রয়োজনবোধে রোগীর মুখে ঢুকিয়ে জিভ পরীক্ষা করবার জন্য, তারপর ল্যাবরেটরির চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ক্লেইন চললেন আগন্তুকের সঙ্গে কথা কইবার জন্য। কেতাদুরস্ত লোক এই ডাক্তার।

হাত-পা ছড়িয়ে ইজি-চেয়ারে পড়ে আছে আগন্তুক। ওর আগাপাস্তলা এক নজর দেখে নিলেন ক্লেইন। কদাকার মানুষ একটা, মাছের চোখের মত চোখ। চিত্রবিচিত্র দাগ গায়ের চামড়ায়, বিবর্ণ ফুলো-ফুলো হাত। লোকটার পোশাক যেন পোশাকই নয়, একটা বস্তা যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ওর গায়ে।

নালী-ঘায়ের রোগী এ? না আজেবাজে বীমার এজেণ্ট? বীমা যদি হয়, এক কথায় বিদায় করা যাবে, ক্লেইনের দরকার নেই ওতে। তবে সে কথা পরে। লোকটার মুখের ভাবই কেমন ভুতুড়ে, গা ছমছম করছে ক্লেইনের।

লোকটা চেয়ারে বসেই বলল—"ডাক্তার ক্লেইন বোধহয়?"

কথা কইছে? না, কুলকুচো করছে? শুনতে গিয়েই ক্লেইনের শিরদাঁড়ায় যেন গজিয়ে উঠছে সারি সারি ফুসকুড়ি।

দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার, প্রশ্নের জবাব তখনও দিয়ে উঠতে পারেননি। এমন সময় তাঁর খেয়াল হল লোকটার ভাবলেশহীন দৃষ্টি তাঁরই উপরে নিবদ্ধ, এবং তাঁকেই উদ্দেশ করে সে কুলকুল করে কথা কয়ে চলেছে।

কথাটা কী ?

"আমরা হচ্ছি একটা কদাকার মানুষ, মাছের চোখের মতন চোখ, চিত্রবিচিত্র দাগ গায়ের চামড়ায়, বিবর্ণ ফুলো-ফুলো হাত।"

নিকটতম চেয়ারটাতেই ধপ্ করে বসে পড়লেন ডাক্তার ক্লেইন। কী আশ্চর্য! লোকটা ঠিক একটা একটা করে তাঁরই মনের কথাগুলো আউড়ে চলেছে যে! আশ্চর্য তো লাগছেই, ভয়ও করছে কেমন! এত জোরে চেয়ারের হাতল চেপে ধরেছেন ডাক্তার যে আঙ্গুলের গাঁটগুলো ফোসকার মত উঁচু হয়ে উঠেছে।

আগন্তুক তখনও কুলকুলিয়ে বলে যাচ্ছে—"আমাদের পোশাক পোশাকই নয় যেন, একটা বস্তা যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে গায়ে। হয়ত আমরা নালী-ঘায়ের রোগী, নয়ত বা আজেবাজে বীমার এজেন্ট, যে-বীমাতে কোন দরকারই নেই ডাক্তার ক্লেইনের। আমাদের মুখের ভাবই কেমন ভূতুড়ে, দেখলে গা ছমছম করে।"

ক্লেইন বজ্রাহত। তাঁর দিকে তাকিয়ে বক্তার নিষ্প্রভ দুটো চোখ চাকার মত ঘুরছে যেন, তেরছা-ভাবে লক্ষ্য করছে ক্লেইনকে। ওদিকে কুলকুলনির তার বিরাম নেই—"গলার স্বর আমাদের কুলকুচোর মত, শুনতে গেলেই শিরদাঁড়ায় যেন গজিয়ে ওঠে সারি সারি ফুসকুড়ি।"

নেতিয়ে পড়তে পড়তেও ক্লেইন নিজেকে চাঙ্গা করে তুললেন প্রবল চেষ্টায়। মুখ-চোখ লাল টকটক করছে ভদ্রলোকের, অল্প অল্প কাঁপছেনও তিনি। সমুখে ঝুঁকে কথা কইতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে তাঁর অকথিত উক্তি তিনি শুনতে পেলেন আগন্তুকেরই মুখ থেকে—"কী সর্বনাশ! মানুষের মনের চিন্তা পড়তে পারেন আপনি?"

ক্লেইন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর অমনি তাঁর মুখের উপর মৃত্যুশীতল দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ও বলে উঠল—"বসুন"—

তবু ক্লেইন দাঁড়িয়েই আছেন। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে তাঁর কপালে, ঝরেও পড়ছে মুখের ভাঁজ বেয়ে বেয়ে।

ও-লোকটা আবারও বলছে—"বসুন।" এবার তার স্বর রূঢ়, শাসানির মত। সে-স্বর শুনে ক্লেইনের হাঁটু থেকে সব জোর যেন চুঁইয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। ধপ্ করে আবারও তিনি বসে পড়লেন।

কী বীভৎস ওর মুখের ঐ অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে রং!

"কো-কোথাকার শয়তান হে তু-তুমি ?"—প্রশ্ন করতে গিয়ে কথা আটকে যেতে লাগল ক্লেইনের মুখে।

"ঐ যে ! ঐ !"—খবরের কাগজ থেকে কেটে-বার-করা একটা টুকরো সে ফেলে দিল ক্লেইনের দিকে।

প্রথমে অবহেলায় চোখ বুলিয়ে নিলেন ক্লেইন কাগজটুকুর উপর দিয়ে একবার। তার পরে কিন্তু আরও একবার দেখতে হল মনোযোগ দিয়ে। তারপর তিনি কলহের সুরে বলে উঠলেন—"এ দিয়ে করব কী ? এতে তো লিখছে—কোন্ মড়া-কাটার ঘর থেকে লাশ চুরি হয়েছে একটা—"

"ঠিক লিখেছে—"—সায় দিল লোকটা।

"কিছুই বুঝলাম না"—মাথা নাড়েন ক্লেইন।

"কী-ঈ-ঈ ?"—লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্লেইন।

নিজের চুপসে-যাওয়া ওয়েস্টকোটের দিকে একটা বিবর্ণ অঙ্গুলি নির্দেশ করে ও বললে—"এই সেই লাশ !"

"কী-ঈ-ঈ ?"—আবারও লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্লেইন। কাগজের টুকরোটা আঁকড়ে ধরে থাকার শক্তি তাঁর আঙ্গুলে ছিল না, সেটা উড়তে উড়তে গিয়ে কার্পেটের উপরে পড়ল। চেয়ারে বসে আছে কী ওটা ? তার সমুখে তিনি খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখলেন তাঁর ছয় ফুট দীর্ঘ দেহটা, নিশ্বাস ছাড়লেন দুই একবার ইঞ্জিনের মত হুস-হুস শব্দে, কিন্তু কথা—কথা তাঁর মুখ দিয়ে একটাও বার করতে পারলেন না।

"এই সেই চোরাই দেহটা"—বলল ও। ওর স্বরটা শোনা যাচ্ছে—যেন ঘন তেলের তল থেকে বুদ্বুদ উঠছে। আবার ঐ কাগজের টুকরোটা ও দেখিয়ে দিল আঙ্গুল দিয়ে—"ওতে ছবি আছে একটা। তুমি লক্ষ্য করনি তা। দেখ এইবার লক্ষ্য করে। আমাদের এই যে মুখখানা দেখছ, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ ছবিখানা।"

নিজের কথা বলতে হলেই গোড়া থেকেই যে ও বহুবচন প্রয়োগ করছে, এতক্ষণে

সেটা খেয়াল করলেন ক্লেইন। মাথায় কিছুই আসছে না, তবু জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাদের ? মুখ তো একটা !"

"তা ঠিক। মুখ একটাই। লাশও একটাই। কিন্তু লাশ যারা অধিকার করে বসেছে, তারা অসংখ্য। দেহটা জবর-দখল করেছি আমরা। বসো তুমি—'

"কিন্তু—"

"আগে বসো ! বসো আগে !"—চেয়ারের বস্তুটা ঠাণ্ডা, আড়ষ্ট একখানা হাত ঢুকিয়ে দিল তার ঢিলে-ঢালা জামার ভিতরে। টেনে বার করল মস্ত একটা পিস্তল। তারপর ক্লেইনের দিকে সেটা বাগিয়ে ধরল আনাড়ীর মত। অস্ত্রটার হাঁ-করা মুখের দিকে চোখ রেখে ক্লেইন কাগজটা কুড়িয়ে তুললেন, তারপর চেয়ারে বসে ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

উপরেই লেখা—"মৃত জেমস ক্লেগ, যার মৃতদেহ গতরাত্রে রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়েছে সিমার্সটাউন মর্গ থেকে।"

ক্লেইন একবার আগন্তুকের দিকে চোখ ফেরাচ্ছেন, আর একবার ছবির দিকে। একবার, দুইবার, বারবার। একই চেহারা। নিঃসন্দেহে একই চেহারা। তাঁর ধমনীতে রক্তের প্রবাহ আছাড়ি-বিছাড়ি করছে যেন।

পিস্তলটা একবার নীচু হল, কয়েকবার এধার-ওধার নড়ল, তারপর উঁচু হয়ে উঠল আবার। কথা কইতে গিয়ে লালা পড়ছে ভূতপূর্ব জেমস ক্লেগের মুখ থেকে। "কী প্রশ্ন তোমার মনে জাগছে, তা আমরা জানি। কিন্তু না, এ তা নয় ! মৃগীরোগে অনেক সময় মড়ার মত নিষ্প্রাণ হয়ে যায় মানুষ, আপনা-আপনি বেঁচে ওঠে আবার। এ-ব্যাপার তা নয়। অনুমানটা থেকে তোমার বুদ্ধির পরিচয় খুবই পাওয়া যাচ্ছে, তা ঠিক, কিন্তু কোন মৃগী রোগী অন্যের মনের চিন্তা নখদর্পণে দেখতে পায় না কি ? এ-ব্যাপার মোটেই তা নয়।"

"এ ব্যাপারটা তা হলে কী ?"—অনেকখানি সাহসেরই মালিক বলতে হবে ডাক্তার ক্লেইনকে, তা নইলে রূঢ়-ভাবে ও-প্রশ্ন ঐ পিস্তলহস্ত বস্তুটার মুখের উপর ছুড়ে মারতে পারতেন না তিনি।

"ব্যাপারটা হল, আগেই একবার বলেছি, জবর-দখল।"—চোখ নাচাল ও অস্বাভাবিক রকম—"আমরাই এখন মালিক দেহটার। যাকে বলে ভূতের ভর হে ! তফাৎ শুধু এই যে আমরা ভূতও নই, ভবিষ্যৎও নই, অত্যন্ত বাস্তব বর্তমান।"

একটা পৈশাচিক খল-খল হাসি। "এই ক্লেগ লোকটি বেঁচে থাকতে রসিক লোক ছিল নিশ্চয়। তার মস্তিষ্ক নিয়েই আমরা কথা কইছি তো !"

"যাই বল না কেন, আমি কিছুতেই"—আর যে কী সব বলতে যাচ্ছিলেন ক্লেইন, তা তিনিই জানেন। বলতে কিন্তু দিল না আগন্তুক। "চোপ্"—কড়া সুরে হুকুম চালাল সে—"কথা যা কইবার, আমরাই কইব। তোমার কাজ শুধু শুনে যাওয়া। তোমার উত্তর ভাষায় ফুটবার দরকার নেই, চিন্তাই তো পড়তে জানি আমরা।"

"তা বেশ"—বলে চেয়ারে হেলান দিলেন ক্লেইন।

এতক্ষণে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন তিনি। সেটা এই যে, বদ্ধপাগল একটা এসে জুটেছে তাঁর চেম্বারে। মরা ক্লেগের সঙ্গে চেহারার মিল ওর যতই থাকুক, আর চিন্তাপঠনের বিদ্যে ওর যতই অগাধ হোক, লোকটা স্রেফ একটি উন্মাদ।

বসে বসে দরজার দিকে তাকাচ্ছেন ক্লেইন। টম মার্সার আর কত দেরি করবে? একবার সে এলে হয় যে!

ভূতপূর্ব ক্লেগ তখন বলছে—"তোমার চাকরকেই আমাদের দরকার। অথবা, এই কথা বললেই আরও সত্যি কথা বলা হয় যে এই মৃতদেহটার বদলে একটা জ্যান্ত সুস্থ সমর্থ দেহ আমাদের পাওয়া দরকার অবিলম্বে। তা, সে তোমার চাকরই হোক বা অন্য কেউই হোক—"

হঠাৎ ও অন্য কথায় গিয়ে পড়ে—"তুমি ভাবছ আমরা বদ্ধ পাগল। মোটেই না। দুই দিন আগে একটা উল্কাপাত হয়েছিল শহরের বাইরে, নয়?"

"পড়েছিলাম কাগজে। যদিও উল্কাটা খুঁজে পাওয়া যায়নি—" বললেন ক্লেইন।

"কেন কথা কয়ে নাহক কষ্ট পাও? বলেছি না, তোমার মনের কথা মনের ভিতর থেকেই আমরা পড়ে নিতে জানি? কিন্তু শোনো যা বলছিলাম। উল্কাটা খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেটা মোটেই আশ্চর্য নয়। কারণ আসলে সেটা উল্কাই নয়, সে ছিল মহাকাশচারী বিমান একখানা। অন্য গ্রহের। গ্রহটা হল প্ল্যাণ্টক। নিশ্চয় শোনোনি প্ল্যাণ্টকের নাম? আমাদেরই গ্রহ সেটা। সেখান থেকেই আসছি আমরা। প্লেনখানা ছোটই বলতে হবে, তোমাদের ঐসব দৈত্যাকার বিমানের তুলনায়। তা, ছোটই আমাদের ভাল। আমরা নিজেরাও ছোটই কি না! নিতান্তই ক্ষুদে। অনুবীক্ষণেও দেখা যায় না, এত ক্ষুদে। তবে সংখ্যায় আমরা অনেক, সে-সংখ্যাকে হিসেবে আনাই অসাধ্য।"

ক্লেইনের মনে চিন্তাটা দানা বেঁধে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আগন্তুক তা আত্মসাৎ করে নিয়েছে। সে তড়িঘড়ি বলে উঠল—"না, যা ভাবছ তা নয়। বুদ্ধিমান জীবাণু যাকে বল তোমরা, তা নই আমরা। তার চাইতেও ছোট কিছু। অগুন্তি সংখ্যায় আমরা যখন মিলেমিশে থাকি, আমাদের দেখায় একটা তরল পদার্থের মত। নাম যদি আমাদের দিতেই হয়, দিতে পার বুদ্ধিমান 'বিষাণু'।"

কয়টা লাফে দরজা পর্যন্ত পৌঁছানো যেতে পারে? হিসাব করতে গিয়েই সে-চেষ্টা থেকে বিরত হলেন ক্লেইন। হিসাব চিন্তার পর্যায়ে পৌঁছোলেই তো ধরা পড়ে যেতে হবে।

ও বলছে—"এক হিসাবে অপরের উপরে নির্ভরশীল আমরা, গ্ল্যাণ্টকবাসীরা। কম বুদ্ধিমান অথচ বৃহত্তর-দেহধারী জীবদের উপরে ভর করে কাজ করতে হয় আমাদের। এই দেখ না, এখানে এলাম কী করে? আমাদের চেয়ে আকারে বহু গুণে বড় একটা গ্ল্যাণ্টকী স্তন্যপায়ীর দেহ অবলম্বনে।"

খানিকটা ভিজে কাশি ওর গলার ভিতরে, তারপরে আবার সে কথা কইতে শুরু করল—"আমাদের প্লেন যখন নামল, আমরা যখন বেরুলাম স্তন্যপায়ীটাকে অবলম্বন করে, তোমাদের দেশের একটা কুকুর ক্ষেপে গেল ঐ অচেনা জীবটাকে দেখে। সে তাড়া করল জীবটাকে, আমরা সেই ফাঁকে ঢুকে পড়লাম কুকুরের দেহে। আমাদের দেশের জীবটা চিৎ হয়ে পড়ল আর মরল।

কুকুর দিয়ে আমাদের কাজ হবে না, তা জানি। তবু ঐ কুকুর আমাদের পৌঁছে দিল শহরের ভিতরে লাশ-কাটা ঘরে। সেখানে ক্লেগের দেহটা পেয়ে গেলাম। কুকুরকে ছেড়ে আসতেই সেটা চিৎ হয়ে পড়ল আর মরল।"

হঠাৎ সদর দরজায় আওয়াজ হল একটা, ক্লেইন উৎকর্ণ একেবারে। হালকা পায়ে কেউ চটপট উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

ভূতপূর্ব ক্লেগ ওদিকে বলেই যাচ্ছে—

"ক্লেগের দেহ শক্ত হয়ে গিয়েছিল, আমরা ওর ভিতরে ঢুকেই গিঁটগুলো আলগা করে দিলাম, পেশীগুলোকে সজীব করে তুললাম, দেহটাকে সচল হতে বাধ্য করলাম। লোকটা বেঁচে থাকতে বুদ্ধিসুদ্ধি রাখত, মস্তিষ্ক ওর মৃত অবস্থায়ও বহন করছিল জীবৎকালের যাবতীয় স্মৃতি। সেই সবই কাজে লাগাচ্ছি আমরা এখন। এই পিস্তলটার কথাই ধর। এ কী বস্তু, এ কী কাজে লাগে, কেমন করে একে কাজে লাগানো যায়। তা ক্লেগের স্মৃতিতেই ছিল, আমরা তারই সদ্ব্যবহার করেছি মাত্র।"

ওদিকে সেই হালকা পায়ের আওয়াজ নিকটবর্তী ক্রমশঃ।

"ক্লেগের দেহে বসন ছিল না। এই দেহকে দিয়ে এই পোশাকটা আমরাই চুরি করিয়েছি। চুরি করিয়েছি এই পিস্তলটাও। দরকার হলে এই হাত দিয়ে গুলিও চালাবে এই দেহ। অতএব তুমি সাবধান।"

ক্লেইন দরজার দিকে একটা লাফ দেবার কথা চিন্তা করতে যাচ্ছিলেন, এই সতর্কবাণী শুনে তাঁকে নিরস্ত হতে হল। ওদিকে পদশব্দ চেম্বারের দরজাতেই এসে পড়েছে।

"মৃতদেহ দিয়ে বেশীদিন কাজ চালানো যায় না, তা বোঝো নিশ্চয়ই।" বলছে ভূতপূর্ব ক্লেগ।

"জ্যান্ত দেহ একটা চাই আমাদের, স্নায়বিক শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে যার, এমন একটা দেহ। আপাততঃ একটা, ক্রমে আরও অনেক। মুশকিল আছে কিন্তু এই ব্যাপারে। সজ্ঞান সচেতন দেহে আমরা জোর করে অধিকার কায়েম করতে গেলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সে দেহের মালিকটা সেই সংঘাতে পাগল হয়ে যায়। তার মস্তিষ্ক হয়ে পড়ে বিকল, তাকে দিয়ে তখন আর কী কাজ হবে আমাদের? বিকল যন্ত্র যেমন আর কি! বিগড়ে গেলে মোটর বল, রেডিও বল, সবই কাজের বার।"

পায়ের শব্দ থেমেছে, চেম্বারের দরজা খুলছে কেউ। খুট করে শব্দ একটা, দরজা বন্ধ করে কেউ ভিতরে ঢুকছে এসে। এই ঘরের দিকেই সে আসছে।

অমানুষিক মানুষটা ওদিকে তার চরমপত্র দাখিল করে দিয়েছে—"আমরা তাই তোমার কাছে সাহায্য চাইছি একটু। একটা সুস্থ সবল মানুষকে অজ্ঞান করে দাও তুমি, যাতে আমরা জবর দখল কায়েম করবার সময় তার ইচ্ছাশক্তি থাকে নিঃসাড় হয়ে। তারপর তাকে আবার জাগিয়ে দাও তুমি, আমাদের অধিকার তার দেহমনের উপরে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরে।"

দরজা খুলে একটি মেয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বয়স অল্প, স্বাস্থ্য অনিন্দ্য, চমৎকার দেখতে। তার দিকে এক পলক দেখে নিয়ে আগন্তুক বলল ক্লেইনকে—"পহেলা মক্কেলটি ভালই জুটল। এখন তোমার কাজ যা বলেছি—আমাদের সাহায্য করা।"

ঘরে ঢুকবার মুখেই ঐ মরা-মুখের বিভীষিকা দেখতে পেয়ে তরুণীর নীল চোখ তখন ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে।

প্ল্যাণ্টকী বিষাণুও কি সৌন্দর্য দেখে চঞ্চল হয়? না কি, ভূতপূর্ব ক্লেগের মস্তিষ্ক এখনও জীবৎকালের সংস্কার ভুলে যেতে সক্ষম হয়নি? কারণ যা-ই হোক, সেই ক্লেগের দেহটা আড়ামোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে, আর টলতে টলতে দুই পা এগিয়ে গেল নবাগতার দিকে। মুখে তার কদর্য হাসি একটা।

তাকে নিকটবর্তী দেখে, এবং তারও চেয়ে বড় কথা—তার মুখের ঐ বীভৎস হাসি দেখে সুন্দরী চেঁচিয়ে উঠল ঘৃণায় আতঙ্কে, আর একটি চিৎকার দিয়েই মেজেতে লুটিয়ে পড়ল অজ্ঞানের মত।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেইন এক লাফে এসে পড়েছেন তার কাছে, আর তাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছেন ঘরের কোণের লম্বা টেবিলে।

সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ভূতপূর্ব ক্লেগও—"অজ্ঞান হয়ে থাকলে সুবিধেই হয়েছে।

গণ্ডারের মত তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্সার।

আমরা তাহলে এক্ষুণি ঢুকে পড়তে পারি ওর দেহের ভিতরে।”

কিন্তু গ্ল্যাণ্টকীর সে-আশায় ছাই দিয়ে সুন্দরী দুচোখ মেলে চাইছে তার দিকে ভয়ে বিতৃষ্ণায়।

“না, হল না তা। ওহে ডাক্তার, তোমায় একটু খাটতেই হল”—বলল গ্লাণ্টকী। “অজ্ঞান করার ওষুধ কিছু দাও ওকে। কী ভাবছ? ঈথারের কথা? ঈথার দিলে অজ্ঞান হয় বুঝি? দাও তবে তাই, এক্ষুণি দাও।”

সিঁড়িতে আবার পায়ের শব্দ। এবারকার শব্দ ভারী পায়ের, যেন একটা গণ্ডার উঠে আসছে প্রত্যেকটা ধাপ দুরমুশ করতে করতে। উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন ক্লেইন।

“ভাবছ তোমার মার্সার চাকরটা এল বুঝি? ভালই হল। আমরা গ্ল্যাণ্টকীরা দলে যথেষ্ট পুরু হয়েই এসেছি, একসাথে দুইজনের উপরে ভর করা কিছু শক্ত হবে না। ঈথারটা বেশী করে বার কর, দুইজনের মত। দেরি করলে মরবে, বলে দিচ্ছি। না, না, যা ভাবছ তা নয়। মরেও রেহাই পাবে না। তোমাকে গুলি করে মারবার পরে তোমার দেহে আমরাই ঢুকব, তোমারই মস্তিষ্ক খাটিয়ে ঈথার প্রয়োগ করব এই মেয়েটার আর ঐ চাকরটার উপরে। নিস্তার তুমিও পাবে না, এরাও পাবে না। তার চেয়ে হুকুমমত কাজ করে যাওয়াই কী ভাল নয়? নিজের জান দিয়েও যখন কারও কোন উপকার করতে পারছ না?”

দরজা খুলে টম মার্সার ঢুকল ঘরে, “মালিক! রাস্তায় গাড়ির চাকা ফেঁসে গেল, তাই এত দেরি—”

লোকটাকে দেখে নেবার জন্য গ্ল্যাণ্টকী ঘুরে দাঁড়াল।

পিস্তল উঁচোনোই রয়েছে তার হাতে।

আর তাই দেখেই ক্রুদ্ধ গণ্ডারের মত তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্সার। এক

সেকেণ্ডের ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশের মধ্যে গ্ল্যাণ্টকী ধরাশায়ী। তার হাতের পিস্তল থেকে গুলি ছিটকে গিয়ে বিঁধল দেয়ালের গায়ে। সশব্দে প্ল্যাস্টার ভেঙ্গে পড়ল খানিক।

"মেরে ফেল! মেরে ফেল!"—হুংকার করছেন ক্লেইন।

তিন-মনী পালোয়ান মার্সার গ্ল্যাণ্টকীর বুক-পেটের উপর দাঁড়িয়ে ক্রমাগত লাফাচ্ছে। দেখতে দেখতে বমি শুরু করল গ্ল্যাণ্টকী। থকথকে কাদার মত সবুজবর্ণ বমি। গ্ল্যাণ্টক গ্রহের বিষাণুরা ভূতপূর্ব ক্লেগের দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ছে মার্সারের পায়ের পেষণে।

এক্ষুণি সারা ঘর ডুবে যাবে ঐ সবুজ কাদায়। ক্ষিপ্রহস্তে সমস্ত ঘরে ঈথার ছড়িয়ে দিলেন ক্লেইন। তারপর মেয়েটিকে তুলে নিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। "মার্সার! বেরিয়ে পড় এক্ষুণি! শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়!"—হাঁক দিচ্ছেন ততক্ষণ ক্রমাগত।

মার্সার বেরুনো-মাত্র পকেট থেকে লাইটার বার করে সেই ঈথারে-ভরা ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে মারলেন ক্লেইন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সারা কক্ষ। গ্ল্যাণ্টকী বিষাণু থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার আর কোন উপায় ছিল না।

আগুন! আগুন! হইহই! দমকল! পুলিস!

নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি সসংকোচে বলছে ক্লেইনকে—"আমি এসেছিলাম—আপনাকে ডাকবার জন্য। আমার ভাইয়ের হাম হয়েছে।"

ক্লেইন হাসি-হাসি মুখে বললেল—"চলুন, যাচ্ছি।"

যাওয়ার আগে তিনি কিন্তু মার্সারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ও তো মানুষের চিন্তা পড়তে জানত। তুমি ওকে আক্রমণ করতে যাচ্ছ, সে-চিন্তা ও জানতে পারল না কেন, কিছু বলতে পার?"

"চিন্তা মালিক?"—মার্সার জবাব দিল—"কোন চিন্তাই তো আমি করিনি! হাতে ওর পিস্তল, এই দেখেই আমি লাফিয়ে পড়েছিলাম। পিস্তল উঁচিয়ে যে ঘরে ঢুকেছে, তাকে আক্রমণ করব কি করব না, এও আবার চিন্তা করে নাকি কেউ?"

---

* ই. এফ. রাসেল-এর "এ ম্যাটার অব ইনস্টিংট" অবলম্বনে।

উৎকলেন্দ্র মুকুন্দ হরিচন্দন

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

উৎকলের আজ দুর্গতির অন্ত নেই। মহান অনন্তবর্মন, সোত্তর বৎসর যিনি একাদিক্রমে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন এই পুণ্যভূমিতে, তাঁর স্মৃতি আজ অতীতের জঠরে প্রায়বিলীন। তাঁর বংশধরদের দুর্বল হস্ত থেকে বাহমনি সুলতানেরা একদা রায়চূর দোয়াব যখন ছিনিয়ে নিতে উদ্যোগী হল, তখন সিংহপুরুষ যে কপিলেন্দ্র সিংহাসন অধিকার করেছিলেন শুধুমাত্র দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য, তাঁকেও বড় আর মনে পড়ে না উৎকলীদের।

আজও সেই কপিলেন্দ্রের বংশই অধিষ্ঠিত রয়েছে উৎকল সিংহাসনে, কিন্তু পূর্ব গৌরবের ক্ষীণতম রশ্মিটুকুও আজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে না সেই বহুযুগের মহিমামণ্ডিত পুণ্যপীঠ থেকে। তিন চার পুরুষ ধরেই প্রজারা দেখছে, রাজদণ্ড ধারণের মত শক্তির সুস্পষ্ট অভাব রাজার বাহুতে, অন্তর্বিপ্লব দমিত হয় না, বহিঃশত্রুর আক্রমণ আসছে তরঙ্গে তরঙ্গে, দেশটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

রাজা তখন মানবেন্দ্র, মন্ত্রী তাঁর গোবিন্দ ভোই। ভোই-মন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করেছেন মাত্র এক বৎসর আগে। কোন বনিয়াদী বংশের সন্তান নন, কোন যুদ্ধে সৈনাপত্যও করেন নি কোনদিন। বস্তুতঃ, উৎকলী রাজনীতির ক্ষেত্রে একরকম অজ্ঞাতই ছিলেন তিনি। হঠাৎ এইরকম একটা অখ্যাত মানুষকে, তাও আবার তিনি প্রবীণও নন, পণ্ডিতও নন, মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করতে দেখে দেশের লোক হয়েছিল বিস্মিত, রাজার সঙ্গে যাঁরা অন্তরঙ্গ, তাঁরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন মানবেন্দ্রের দিকে।

"ওটা কী জান?"—মানবেন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন—"লোকটির কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত ছিলাম। তখনও রাজা হইনি আমি, একদিন দৈবযোগে প্রাণ হারাতে বসেছিলাম, দৈবানুগ্রহে ঐ গোবিন্দই রক্ষা করেন আমাকে। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে সেই মুহূর্তে আমি কথা দিয়েছিলাম—কোন দিন রাজপদ লাভ করি যদি, ওঁকেই করব মন্ত্রী। যখন সিংহাসন পেলাম, তখনই খোঁজ করেছিলাম ওঁর, পাইনি খুঁজে, তীর্থ দর্শনে নাকি গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখা করলেন, আমিও তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীপদে নিয়োগ করলাম ওঁকে। সুবিধাও ছিল, পদটা তখন খালি ছিল।"

সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজধর মাথা নাড়লেন—"মহারাজের কৃতজ্ঞতার ঋণ অবশ্যই শোধ হল, কিন্তু প্রজাসাধারণ ওঁর বা অন্য কারও কাছে কোনদিন কোন ঋণ না করেও আজ গুণোগার দিতে বাধ্য হচ্ছে, করের বোঝা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ানোর দরুন। চিরকাল চাষীরা খাজনা দিত ফসলের ছয়ভাগের এক ভাগ, নতুন মন্ত্রীর আমলে তারা দিচ্ছে সিকি পরিমাণ। অবশ্যই রাজার সম্মতি নিয়েই নতুন বিধান চালু করেছেন ভোই মহাশয়।"

"সম্মতি?"—রাজার ললাটে চিন্তারেখা ফুটে উঠল—"কী যেন মনে পড়ে বটে। তা সে তো অনেক প্রাচীন ব্যাপার। ঐ ছয় ভাগ ব্যবস্থা। এখন যুদ্ধবিগ্রহ ঘন ঘন হয়, সৈন্যসজ্জা বজায় রাখতে খরচা হয় বেশী, ফসলের সিকিটা না পেলে রাজা রাজ্য চালাবে কেমন করে?"

"এ নিয়ে কিন্তু প্রজারা খুশী হবে না মহারাজ"—বললেন রাজধর। রাজা হেসে উঠলেন, জবাব দিলেন না। রাজধরও বললেন না আর কিছু।

কিন্তু রাজধর বলেছিলেন ঠিক। প্রজারা খুশী হয় নি খাজনা বেড়ে যাওয়ায়। এক বৎসর হল গোবিন্দ মন্ত্রী হয়ে এসেছেন, সে-অসন্তোষ দিনের দিন বেড়েই চলেছে। গোবিন্দ যে ও বিষয়ে সচেতন, তাতেও সন্দেহ নেই। প্রজার অসন্তোষে তিনি ক্ষুব্ধ। কিন্তু উপায়ান্তর কী? রাজার বিলাসিতা কমানো চলে না। দেবসেবার আড়ম্বর হ্রাস করার কোন প্রশ্নই তোলা যায় না। তাহলে দেশরক্ষার ব্যয় বহন করে কে? সে-ব্যয় যে বেড়েই চলেছে? বাহমনি আর নেই, বিজয়নগর সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু সাপ মরলেও সাপের ডিম রয়েছে কাঁড়ি কাঁড়ি। দু'টো সাম্রাজ্যের জায়গায় ক্ষুদে রাজ্য গজিয়েছে দশটা। তাদের প্রত্যেকেই এক এক খাবল কামড়ে নিতে চায় উৎকলের অঙ্গ থেকে। বাধা দেবে কে? সৈন্য থাকলেই হয় না শুধু। তাদের হাতে অস্ত্র থাকা দরকার। সে-অস্ত্র কেমন করে ব্যবহার করতে হবে, সে জ্ঞানও তাদের থাকা দরকার। অথচ সে-সবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

রাজধর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে প্রজারা খুশী হবে না। খুশী তারা হয় নি, তা ঠিক। কিন্তু অসুখী হয়েও অনেক ব্যাপারে তারা শান্ত থাকে। চিরদিনই থেকে এসেছে

তাই। কিন্তু এবার তারা যেন শান্ত থাকতে রাজী নয়। রাজার কানে ছোট ছোট খবর আসে। মন্ত্রীর মুখ থেকে নয়। রাজবয়স্যদের মুখ থেকে। ছোটখাটো খবর। এখানে পাটোয়ারের সাথে চাষীর বচসা হল, ওখানে ধর্মগোলার ধান জমা দিতে রাজী হল না গাঁয়ের লোক—এই রকম সব আর কি! গোলমাল হয়, আগেও হত, যখন খাজনার পরিমাণ মাত্র ছয় ভাগের ভাগ ছিল। রাজা জানেন সে-কথা। "সব ঠিক হয়ে যাবে"—বলে বয়স্যদের আশ্বাস দিয়ে প্রসঙ্গ পালটে ফেললেন তাড়াতাড়ি।

কিন্তু ঠিক যেটা হয়, সেটা অস্থায়ীভাবে হয়। এক জায়গা ঠিক হতে হতেই অপর জায়গা বেঠিক হয়ে আসে। মন্ত্রীকে বাধ্য হয়ে কড়া হতে হয়। আবদার শুনতে তিনি রাজী নন। সেনাবাহিনীকে জোরদার করে তুলতে হলে দেশের লোককে কষ্ট পেতে হবে একটু। খাজনা বেড়েছে, দরকার হলে আরও বাড়বে। দরকার হবেই। এখন বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বিশ হাজারও নয়। ওটা লক্ষ হওয়া দরকার। অনিবার্য। পাঠান হাঁক দিচ্ছে বঙ্গ-সীমান্তের ওপার থেকে। তাদেরও যদি ঠেকানো যায়, বিহার পর্যন্ত এগিয়েছে মোগল, যারা পাঠানের চেয়েও দুর্মদ। ক্রমেই পরিস্থিতি হয়ে ওঠে জটিল থেকে জটিলতর।

প্রজারাও মারমুখো, মন্ত্রীও মরিয়া। রাজধরেরা নীরব নেই। অবিরত রাজার কান ভারী করে তুলছেন। এ-মন্ত্রীকে বিদায় দিতেই হবে, তা নইলে প্রজাবিদ্রোহ হবে অনিবার্য। কপিলেন্দ্র মহারাজের বংশধর শেষে দুর্নাম কিনবেন প্রজাপীড়ক বলে? ইতিহাসে মন্ত্রীর নাম উল্লেখ থাকবে না, থাকবে রাজার।

উত্যক্ত হয়ে রাজা ডেকে পাঠালেন গোবিন্দকে। "আমি তো অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি বাপু! তুমি একটু রাশ আলগা দাও। নইলে আমাকে বানপ্রস্থ নিতে হয় এই অনতিক্রান্ত প্রৌঢ় বয়সে।"

"মহারাজ কি দেশটাকে শত্রুর মুখেই তুলে দিতে চান?"—প্রশ্ন করলেন মন্ত্রী।

"শত্রু? কোন্ শত্রু?"

"বাংলার পাঠান। উত্তর ভারতের মোগল!"

"তারা তো কোনদিন আক্রমণ করেনি। আমার বিবাদ নিইও কিছু তাদের সাথে। কেন তারা আক্রমণ করবে?"

"মহারাজ! একটু চিন্তা করে দেখলেই আপনি বুঝবেন যে আক্রমণ করবার অনেক কারণ আছে। রাজ্যলালসা আছে, ধর্মপ্রচারের নেশা আছে, দিগ্বিজয়ী বলে কীর্তি রেখে যাওয়ারও আকাঙ্ক্ষা আছে অনেকের। আর কী বলছেন? আগে কখনও আক্রমণ করে নি? আমাদের করে নি, কিন্তু পঞ্চনদে করেছে, থানেশ্বরে কনোজে কোশলে মগধে এবং সর্বশেষ গৌড় বঙ্গে। কোথায় করে নি? আমরা দূরে আছি বলেই আমাদের

পালা দেরিতে আসছে, এই যা। কিন্তু আর বেশী দেরি নেই। পাঠান দোরগোড়ায়। ওরা এল বলে।"

"আসেই যদি, আমরা যুদ্ধ করে পারব কেন ওদের সাথে? সন্ধি করতে হবে। কিছু কিছু কর দিতে হবে। ওদের সঙ্গে পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদ লক্ষ্মণসেন কেউ যদি না পেরে থাকে, আমাদের না-পারার মধ্যে অগৌরব কী?"

"গৌরব অগৌরবের প্রশ্ন নয়, টিকে থাকা আর টিকে না-থাকার প্রশ্ন। যারা পারে নি, তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, এটা কি দেখছেন না? আমরাও কি নিশ্চিহ্ন হব?"

"বোধহয় হতেই হবে।" —তিক্তস্বরে জবাব দিলেন রাজা—"পাঠান মোগলের হাতে না হই, নিজের প্রজার হাতেই হতে হবে। সব প্রজাকেই তো তুমি ক্ষেপিয়ে তুলেছ, দেখছি। তোমার সৈন্যরা হাত পাকাবার সুযোগ পাবে প্রজাদের ঠেঙ্গিয়ে।"

মন্ত্রী উষ্ণীষ খুলে রাজার পদপ্রান্তে স্থাপন করলেন। [পৃষ্ঠা ২৪৮

"দুর্যোগ ততদূর গড়াবে না, যদি আপনি কয়েকটি লোককে সংযত হওয়ার উপদেশ দেন। তাঁদেরই উসকানি আছে প্রজাদের অসন্তোষের পিছনে।"

"উসকানি? কয়েকটি লোক? কে তারা? বল নাম—" রাজার স্বর দৃপ্ত, উত্তেজিত।

উত্তেজিত তখন মন্ত্রী গোবিন্দও। তিনি সমান দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"নাম? প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীল রাজধরের—"

"বিশ্বাস করি না"—রাজা ফেটে পড়লেন একেবারে—"তুমি আমার বন্ধুদের উপর

খড়্গহস্ত, তা আমি জানি। কিন্তু তাদের ত্যাগ করার চাইতে তোমার ত্যাগ করা আমার সোজা, এটা তুমি পরিষ্কার জেনে রেখো।"

"তবে আমাকেই করুন ত্যাগ"—বলে মন্ত্রী ধীরে ধীরে মাথার উষ্ণীষ খুলে রাজার পদপ্রান্তে স্থাপন করলেন, তারপরে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে ধীরে ধীরে ত্যাগ করে গেলেন কক্ষ।

রাজা আড়ষ্ট। একটা বাদানুবাদের পরিণতি এমন মারাত্মক হতে পারে, এ তাঁর ধারণাতেই ছিল না। তিনি মখমলে-মোড়া সুখশয্যায় চুপ করে পড়ে রইলেন অনেক, অনেকক্ষণ। অর্থাৎ যতক্ষণ না শ্রীল রাজধর এসে চাঙ্গা করে তুললেন তাঁকে—

"গেছে? গেছে মহারাজ? আপদ বিদায় হয়েছে? দুর্গ্রহ কাটল আপনার। শুধু আপনারই বা বলি কেন, আমাদের, প্রজাদের, সারা উৎকলের। উঠে বসতে আজ্ঞা হোক। জগন্নাথদেবের মন্দিরে পূজা পাঠাবার আজ্ঞা দিতে আজ্ঞা হোক, চিন্তা কী? ভগবান কি নেই?"

তোষামোদের অসাধ্য কী আছে? রাজাকে উৎফুল্ল করে তুলতে এক দণ্ডও লাগল না রাজধরের। রাজা উঠে বসলেন, মন্দিরে পূজা পাঠাবার আজ্ঞা দিলেন। এবং সবশেষে অনুরোধ করলেন—"বন্ধু রাজধর, যোগ্য মন্ত্রী পাওয়া শক্ত খুব। আমি খুঁজতে থাকি, ততদিন তুমিই কাজটা চালিয়ে যেতে থাক। পুরোপুরি বা পাকাপাকি মন্ত্রী তোমায় আমি করছি না। তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই আমার, কিন্তু তোমায় যদি মন্ত্রীর সেরেস্তায় অষ্টপ্রহর আটকে থাকতে হয়, আমার জীবনটাই যাবে একদম মরুভূমি হয়ে। এই দুটো দিন অবশ্য সইব কষ্ট, কিন্তু যেমন তেমন লোক একটা পেলেই—"

অষ্টপ্রহর? এক মুহূর্তও মন্ত্রীর সেরেস্তায় বসতে হল না রাজধরকে। রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি একদল দেহরক্ষীকে ডাকলেন, রাজাদেশ জানিয়ে, তারপর তাদের নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন সচিবালয়ের দিকে। এই ভবনেরই সামনের দিকে মন্ত্রীর সেরেস্তা, পিছনের অংশে মন্ত্রীর বাসস্থান।

বিদায়ী মন্ত্রী তখনও গেরস্তালি গুছিয়ে তুলে বিদায় নিতে পারেননি, এই এক বৎসরের অতিথিশালা থেকে, এমন সময়ে রাজধরের প্রবেশ। নিজে যারা পরগাছা, তাদের স্বভাবই এই যে সুযোগ পেলেই স্বাধীনচেতা লোকেদের এক হাত দেখে নেবার চেষ্টা করে। সে নিজে আজ মন্ত্রী, অস্থায়ী হলেও মন্ত্রী, পদচ্যুত মন্ত্রীকে অপদস্থ করার একটা চেষ্টা সে কি না করে পারে?

কাজ রাজধরের যা-কিছু, তা অবশ্য বাইরের মহলেই। কিন্তু সেখানে এক পলকের

জন্য একবার দেখা দিয়েই সে সোজা চলে গেল ভিতর বাড়িতে, সেখানে অন্তঃপুরিকাদের থাকা সম্ভব, এটা জানা থাকা সত্ত্বেও। ঢুকতে ঢুকতে সে চ্যাঁচাচ্ছে—

"কী মশাই, এখনও গুছিয়ে তুলতে পারেন নি সব? তা দেরি হবে বই কি! এক বছরে রোজগার কম করেন নি, বাড়তি খাজনাগুলো সব নিজের সিন্দুকেই তুলেছেন তো! গাঁটরি বাঁধতে সময় তো লাগতেই পারে!"

"মুখ সামলে কথা বল বেয়াদব!"—বলে লাফিয়ে এসে রাজধরের গালে এক চড় কষিয়ে দিল যে যুবক, তাকে রাজধর ইতিপূর্বে কখনও দেখে নি। রক্ষীরাও না। লম্বা চওড়া চেহারা। বড় বড় দুটো চোখ এই মুহূর্তে জ্বলছে যেন বাঘের চোখেরই মত।

মুকুন্দ চোখের পলকে নিকটতম রক্ষীর তরোয়ালখানা খাপ থেকে বার করে নিল। [পৃষ্ঠা ২৫০

"আরে, আরে, মুকুন্দ! করলি কী?"—বলে ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন গোবিন্দ, ছোটভাইকে টেনে সরিয়ে দিলেন রাজধরের সমুখ থেকে। আর সেই মুহূর্তে বসনের ভিতর থেকে ছোরা বার করে রাজধর—

চড় মেরেছে যে-লোক, সে যে আর সামনে নেই, সামনে যে আছে সে যে অন্য লোক, তা ঠাহর করে দেখবার মত স্থৈর্য তখন রাজধরের নেই, সে ছোরা বসিয়ে দিল গোবিন্দর বুকে। পিছনে হটে যেতে গিয়ে টাল খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি।

"দাদা! দাদা!"—আর্তস্বরে একটা চিৎকার করে উঠল মুকুন্দ। একবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে গেল ধরাশায়ী দাদার বুকে, কিন্তু তা সে গেল না। চকিতে নিজেকে সংযত করে নিল, চকিতে কর্তব্যও স্থির করে ফেলল।

রক্ষীরা আচমকা এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখে ভয়ে বিস্ময়ে জড়বৎ হয়ে গিয়েছিল একেবারে, ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল মৃত মন্ত্রীর দেহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, মুকুন্দ চোখের পলকে নিকটতম রক্ষীর কটি-বিলম্বিত তরোয়ালখানা টেনে খাপ থেকে বার করে নিল আর রাজধর সতর্ক হতে-না-হতে এক কোপে তার মুণ্ডটাই উড়িয়ে দিল ঘাড় থেকে।

পর মুহূর্তেই সে আর ঘরের ভিতর নেই। পিছনের দিকে ছুটেছে, তরোয়াল হাতে নিয়েই। রক্ষীরা যখন অনুসরণ করল তার, তখন সে অর্গল রুদ্ধ করে দিয়েছে ভিতরের ঘরে গিয়ে। দরজা ভেঙ্গে হাঁকডাক করে যখন রক্ষীরা সেখানে প্রবেশ করল, তখন সে-ঘর, সে-মহল বিলকুল খালি। পশ্চাদ্বার দিয়ে মুকুন্দ পালিয়েছে।

পালিয়ে যাবে কোথায়? গ্রামে গিয়ে নিস্তার নেই, রাজার সিপাহী সেখানে গিয়েই ধরবে তাকে। তা ছাড়া গ্রামে সে জনপ্রিয় নয়, কারণ সে হল গোবিন্দর ভাই, যে-গোবিন্দ সমস্ত প্রজার চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন করভার বাড়িয়ে দেওয়ার দরুন। সুতরাং গ্রামে সে যাবে না।

অতএব সে আত্মগোপন করলো। যখন নিজেকে প্রকাশ করলো আবার, তখন সে ডাকাত। ছয় মাসের মধ্যেই সে বৃহৎ একটা দস্যুদল গড়ে তুলেছে। সাধারণতঃ দস্যু বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু এরা নয়। এরা কোন ধনীর বাড়িতে ডাকাতি করে না, করে না লুঠ রাজার কোষাগারও। তবে এরা করে কী? খায় কী?

করে কী, সে-কথা পরে হচ্ছে। আগে আলোচনা করা যাক, খায় কী এরা। ক্ষেতে যখন যে-শস্য পেকেছে, তারা গিয়ে রাত্রিবেলা তার একটা অংশ কেটে নিয়ে আসে; গোবিন্দ মারা যাওয়ার পরে রাজা আবার প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী খাজনা নিচ্ছেন ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ। গোবিন্দর দাবি ছিল সিকি। কাজেই ঐ যে দুই ভাগের কমতি, ঐটাই কেটে নিয়ে যায় এই ডাকাতেরা। ঐতেই তাদের খাওয়া-দাওয়া চলে এবং উদ্বৃত্তও থাকে অনেক। সেই উদ্বৃত্তটা ওরা বেচে দেয়, আর সেই অর্থে দলবৃদ্ধি করে, অস্ত্রশস্ত্র কেনে, নিজেদের সংগঠিত করে একটা সৈন্যদলের আদর্শে।

মানবেন্দ্র রাজার আমলে প্রশাসন শিথিল। চোর ডাকাত নিয়ে রাজা বিশেষ মাথা ঘামান না। নতুন মন্ত্রী রাঘবনাথও না, তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন খণ্ডগিরির মাথায় একটি বৃহৎ মন্দির গড়ে তোলার ব্যাপারে। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, মাসের ভিতর কুড়িদিন তাঁকে সেখানেই কাটাতে হয়। রাজারও প্রচুর উৎসাহ এই মন্দির সম্পর্কে। মাঝে মাঝে তিনিও যান মন্দির দেখতে। একদিন সেই রকম পরিদর্শনেই গিয়েছেন তিনি, গিয়ে মন্ত্রীকে বলছেন—"একটা দেখবার মত জিনিস যেন হয় রাঘবনাথ! অর্থের জন্য চিন্তা নেই, রাজকোষে না থাকে তো প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করুন। ধর্ম-

কর্মে ব্যয় করবে না তো করবে কিসে ওরা? খাজনা নিচ্ছি ছয় ভাগের ভাগ। ওটা সিকি পরিমাণ করে নিন। গোবিন্দ তো তাই করতো! তখন তো দিত প্রজারা! এখনই বা দেবে না কেন?"

একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলল এক বোকা পারিষদ—"রাজা এখন সিকি নেন যদি, আর মুকুন্দ ডাকাত নিচ্ছে বারো ভাগের ভাগ, দুইয়ে মিলে প্রজাদের দিতে হবে তিন ভাগের এক ভাগ। বেশী হল একটু।"

"মুকুন্দ ডাকাত? মুকুন্দ ডাকাত? গোবিন্দ মন্ত্রীর ভাই মুকুন্দ ডাকাত? তাকে আজই ধরবার ব্যবস্থা করছি দাঁড়াও—"

বলে রাজা পালকি চড়ে রাজধানীতে রওনা হলেন। কিন্তু পৌঁছোনো আর হল না। খণ্ডগিরির পাদদেশে যে বিস্তীর্ণ আরণ্যভূমি ছিল সেদিনে, তারই ভিতরে ডাকাতে ঘিরে ফেলল রাজাকে। সৈন্য? একশো সৈনিক ছিল রাজার সঙ্গে। দেখা গেল তাদের মধ্যে অর্ধেকই ছদ্মবেশী দস্যু। আর দস্যু সেই বোকা পারিষদটিও, যে মুকুন্দ ডাকাতের বারোভাগ খাজনা আদায়ের কথা তুলে রাজার মাথা বিগড়ে দিয়েছিল।

সাধারণ দস্যু নয়, ঐ বোকাটাই যে সেই কুখ্যাত দস্যুপতি মুকুন্দ, এটাও ক্রমশঃ কর্ণগোচর হল মানবেন্দ্রের। শুনে আফসোসে নিজের হাত কামড়াতে থাকল রাজা। এতদিন তো ও তাঁর মুঠির মধ্যেই ছিল! যে কোন মুহূর্তে ওকে ধরে শূলদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারত! কিন্তু হায়, জানা যায় নি, বোঝা যায় নি। জানা বা বোঝার জন্য চেষ্টাও তিনি করেন নি।

তারই ফলে, রাজধানীতে তাঁকে আর যেতে হল না। রাজশিবিকায় চড়েই তিনি চললেন বন্দীনিবাসে। ঐ পার্বত্য অঞ্চলেরই এক দুর্গম স্থানে একটি বড়-সড়ো গুহাকে আসবাবপত্রে সাজিয়ে বাসযোগ্য করে রাখা হয়েছে। রাজা মানবেন্দ্রের সেখানেই হবে বাসস্থান, যতদিন না তাঁকে কোন দূরবর্তী তীর্থে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারে মুকুন্দ।

অতঃপর অতর্কিতে রাজধানীতে হানা। মানবেন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করবার তাগিদ কারোই ছিল না। মন্ত্রী রাঘব তো নিজেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। কয়েক শো দস্যুতে মিলে যখন সিংহাসনে বসিয়ে দিল মুকুন্দকে, সৈন্যদল শুধু একটি মাত্র দাবি উত্থাপন করল তাঁর কাছে—"আমাদের বকেয়া বেতন শোধ করে দিন, আমরা আপনারই সেবা করব।"

নতুন রাজা বললেন—"অবশ্য। দু'টো দিন সময় দাও আমায়।" নিজের সম্বল যা কিছু ছিল, তার সঙ্গে রাজপ্রাসাদের মূল্যবান গৃহসজ্জা, রাজকোষের সঞ্চিত সব কিছু মণিরত্ন এ-সবের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন মুকুন্দ। তবু বাকী রয়ে

গেল বই কি! তবে নগদ কিছু পাওয়ার দরুন ওদের মনে ভরসা এসেছে এইবার থেকে তাহলে নিয়মিত বেতন তারা পেতে থাকবে।

মুকুন্দ বসলেন সিংহাসনে হরিচন্দন পদবী গ্রহণ করে।

গোবিন্দ যে আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়ে গিয়েছেন, তারই রূপায়ণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে নবীন নরপতি রাজ্যশাসন শুরু করলেন। দেশকে শক্তিমান করে তোলা চাই। পাঠান আক্রমণ আসন্ন, তাকে রুখতে হলে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, তার কিছু মাত্র করা হয় নি। এখন সময় সংক্ষেপ যদিও, তবু আপ্রাণ চেষ্টা একটা তো করতেই হবে দেশরক্ষার জন্য। যে-রাজ্য বাহমনী ও বিজয়নগরের বারংবার হামলাতেও ভেঙ্গে পড়ে নি, সেকি আজ গৌড়ের কররাণি সুলতানের মুকাবিলার অক্ষম হবে?

রাজা শাকান্ন আহার করেন, কোন বিলাসদ্রব্য স্পর্শ করেন না, ভূতপূর্ব রাজ-পারিষদদের তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে যেতে, তারা সেই ভয়ে সোজা দেশত্যাগ করে গিয়েছেন। রাজা মানবেন্দ্র কোথায় আছেন, খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁকেই। খোঁজ পেলেই তাঁর কাছে গিয়ে বেচারীর দুঃখের অন্নে ভাগ বসাতে পারে। ভদ্রভাবে জীবনযাপনের মত অর্থ হরিচন্দন প্রতি মাসে যুগিয়ে যাচ্ছেন মানবেন্দ্রকে।

একদিন দূত এল দিল্লী দরবার থেকে। বাদশাহ আকবরের দূত। বাদশাহ উৎকলরাজ হরিচন্দনের বন্ধুত্ব কামনা করেন। উত্তর থেকে মোগল, দক্ষিণ থেকে উৎকল। একযোগে আক্রমণ করে পাঠানকে টিপে মারা হোক, এই তাঁর উদ্দেশ্য।

হরিচন্দন রাজী হয়ে গেলেন, সন্ধির প্রস্তাবে। কিন্তু মোগল সেনাপতিরা এসে উৎকলী সেনাকে সুশিক্ষিত করে তুলুক, এ-শর্তটা তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। খাল কেটে কুমীর তিনি আনবেন না! নিজের সৈন্যকে কোন খাঁ-সাহেবের হাতে তিনি তুলে দেবেন না।

এ-সন্ধির কথা গৌড়ে প্রকাশ হল যখন, সুলেমান কররানি আর কালবিলম্ব করলেন না। পুত্র বায়াজিদের সৈনাপত্যে উৎকলে পাঠিয়ে দিলেন বিরাট বাহিনী। মোগল আক্রমণ এসে পড়বার আগেই সুলতান উড়িষ্যাকে শেষ করতে চান।

সত্যই মোগল তখনও প্রস্তুত হতে পারে নি পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য। তারা এল না। বায়াজিদের সম্মুখীন হতে হল একা হরিচন্দনকেই। তিন পুরুষ ধরে ভূতপূর্ব রাজারা যে মহাপাপ করে গিয়েছেন, শাসন শৈথিল্যে দেশের শক্তিক্ষয় করে করে, হরিচন্দন স্বল্প কয়েক বৎসরে তার কতটুকু পূরণই বা করতে পেরেছেন? রণদক্ষ পাঠানদের সঙ্গে প্রতি যুদ্ধেই পরাজয় হতে লাগল তাঁর। বায়াজিদ প্রবেশ করলেন পুরী রাজধানীতে।

কালাপাহাড়! ধর্মত্যাগী হিন্দুকুলকলঙ্ক! দেশে দেশে দেবমন্দির আর দেববিগ্রহ চূর্ণ করার জন্য বদ্ধপরিকর নৃশংস দানব। সে এসেছে বায়াজিদের সহকারী হয়ে। যুদ্ধ বায়াজিদ করতে থাকুন, কালাপাহাড় ধাবিত হল জগন্নাথ বিগ্রহ চূর্ণ করবার জন্য। কিন্তু বড় আশায় হতাশ হতে হল তাকে। দারুব্রহ্ম মূর্তি আগেই অপসারিত হয়েছেন। হরিচন্দন তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভূতপূর্ব মন্ত্রী রাঘবের অসমাপ্ত মন্দিরে।

পরাজয়ের পরে পরাজয় বরণ করেও হরিচন্দন ভগ্নোদ্যম হন নি কোনদিন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করে গিয়েছেন পাঠানের সঙ্গে, বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করে করে। আগ্রায় আবেদন পাঠিয়েছেন বারবার—"সন্ধির শর্ত পূরণ কর তোমরা, উত্তর থেকে আক্রমণ চালিয়ে পাঠানের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দাও।"

মোগলের সে আক্রমণ এল একদিন, পাঠান শাসন বিলুপ্ত হল বঙ্গ উৎকল থেকে, কিন্তু মুকুন্দ হরিচন্দন তখন আর বেঁচে নেই। রণক্ষেত্রে নিজের জীবন উৎসর্গ করে তিনি ভূতপূর্ব রাজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন।

অদৃশ্য শত্রুর যম

১৯০০ সালে সদ্যমুক্ত কিউবা দ্বীপে হঠাৎ বহু সৈনিক "ইয়োলো ফিবার" রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। অজানা নতুন রোগের আকস্মিক আক্রমণে চিন্তিত হয়ে দেশের সরকার এক দল চিকিৎসক বাহিনী পাঠালে। বাহিনীর কর্তৃত্বের ভার পড়ল মেজর ওয়াল্টার রীডের ওপর। তিনি প্রথমেই বুঝতে পারলেন মশার কামড়ে রোগের উৎপত্তি। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর এ রোগ হয় না। তাই কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে মশার কামড় খাইয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন ডাঃ রীড। লোকগুলি রোগে আক্রান্ত হয়েও মারা গেল না রীড সাহেবের চিকিৎসায়। তারপর মশার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে রীড সাহেব দু'বছরের মধ্যেই কিউবা দ্বীপকে শুধু মশকশূন্য করেন নি রোগশূন্যও করেছিলেন।

বহু দিন আগে এক বনের ধারে দুই বোন বাস করতো তাদের মা'র সঙ্গে।
ঐ দুই বোনের নাম ছিল—
সোনা ও রূপা
দিলীপ দাস
তারা ছিল যেমন চট্পটে তেমনি ছট্ফটে ঘরের সমস্ত কাজ-কর্ম তারাই করতো
অবসর সময়ে বনের সব পশু-পাখীর সঙ্গে খেলা করতো আর ফল-পাকড় কুড়িয়ে বেড়াত

ক্রমে শীতকাল এলো। প্রচন্ড ঠাণ্ডা আর সেই সঙ্গে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। এই সময় একদিন রাত্রে
ওঃ কি বৃষ্টি! ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাবার অবস্থা!
এমন সময় দরজায় কার যেন করাঘাত পড়লো। মা বললেন—
দেখতো সোনা, বাইরে থেকে দরজায় কে আওয়াজ করছে!
সোনা দরজা খুলে দেখল—
ও মা, বাঁচাও! ভাল্লুক!

ভল্লুক দেখে মেয়ে দুটো দারুণ ভয় পেয়ে গেল
আমাকে দেখে মিছেই ভয় পাচ্ছ, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না।
এখানে তুমি কি চাও?
দয়া করে আমাকে একটু আশ্রয় দিন নতুবা ঠাণ্ডায় জমে যাব।
আহা রে বেচারা ভাল্লুক! এসো-এসো উনুনের আগুনে একটু গরম হয়ে নাও
অশেষ দয়া আপনার
দয়া করে আমার গায়ের জলটা মুছে দেবে তোমরা?

তখন দুই বোন মিলে তার ভিজে যাওয়া লোমগুলো মুছে দিতে লাগল
আচ্ছা, তোমাকে আমরা কি বলে ডাকবো ?
আমার নাম আনন্দ। ঐ নামেই ডেকো।
এসো আনন্দ, এই আগুনে একটু গরম হয়ে নাও।
খুব কাছে যেও না যেন; তোমার গায়ে যা লোম!
কিছু পরে গায়ের জল শুকিয়ে গেল, আর ভালুকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল
তোমার পিঠে আমাদের একটু চড়তে দেবে ?
নিশ্চয়ই দেবো। এসো
৪

(চলবে)

● শহীদ স্মৃতিকথা

ভগোয়া পল্‌টন

রঞ্জন মিত্র

শিক্ষাদীক্ষা ভালই ছিল, দিন কাটছিল শিক্ষকতা করে।

আউরিয়া একটা ক্ষুদে শহর মৈনপুরি জেলায়। সেখানকার দয়ানন্দ ইঙ্গ-বৈদিক বিদ্যালয় হল গেন্দালালের কর্মস্থান। ছেলেদের নিয়ে গড়ে তুলল এক শিবাজী-সমিতি। উদ্দেশ্য—বীর শিবাজীর আদর্শে ওদের গড়ে তোলা, যাতে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের সংকল্প ওদের কিশোরচিত্তে দিনের পর দিন দানা বেঁধে উঠতে পারে।

শিবাজী-সমিতি? ইংরেজ সরকারের রক্তচক্ষুর ভ্রূকুটি পতিত হল গেন্দালালের উপরে। এ লোক সহজ নয়। এ লোক তিলকের চ্যালা না হয়ে যায় না, কিংবা হয়ত সুরেন বাঁড়ুজ্যের। উপর থেকে ইঙ্গিত পেয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাস্টারি থেকে ছাঁটাই করে দিলেন গেন্দালালকে।

ভালই হল। বন্ধনমুক্ত হয়ে স্রোতের শ্যাওলার মত ঘাটে অঘাটে ঘুরতে লাগল গেন্দালাল। না, চাকরির উমেদারি নয়। ও-পাপ আর সেধে কাঁধে তুলবে না ও। ওর এখনকার কাজ হল—উঁচু নীচু সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে একটিমাত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা—আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশের ভবিষ্যৎ কী?

কেউ আঁতকে ওঠে আলোচনার শুরুতেই, ইংরেজ বিদ্বেষের গন্ধ পেয়ে। কুলোর বাতাস দিয়ে গেন্দালালকে বিদায় করে তারা। কেউ হয়ত ধৈর্য ধরে শোনে। খানিকটা আক্ষেপও করে গেন্দালালের সুরে সুর মিশিয়ে। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? বর্তমানে যেটা চলছে, তারই সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের উচিত। তা যে না করবে, তার ভাগ্যে আছে ইংরেজের জেলখানা।

ধুত্তোর বলে গেন্দালাল চলে এল গোয়ালিয়র। সেখানে দেখা হল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। জটা নেই অবশ্য। কিন্তু গেরুয়া আছে। আর ত্রিশূল না থাকলেও হাতে আছে মোটা লাঠি একখানা! শাস্ত্রচর্চার মধ্যে আছে যখন-তখন গলা ফাটিয়ে গীত পাঠ। দুপুর রোদে পথ চলতে চলতেও পথচরেরা শুনতে পায়—লক্ষ্মণানন্দ মহারাজের আশ্রম থেকে দুন্দুভিনাদে নির্দেশ আসছে—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥"

"সাধুটা পাগল"—এই কথাই মনে মনে ভাবে গোয়ালিয়রের মানুষ।

সেই পাগল সাধুর আস্তানায় এসে ভিড়ে গেল ভূতপূর্ব স্কুলমাস্টার গেন্দালাল। মামুলী প্রশ্নটাই করে বসল তাঁকেও—"মহারাজ! এই দুর্ভাগা দেশের ভবিষ্যৎ কী?"

মহারাজ দরাজ গলায় জবাব দিলেন—"ভবিষ্যৎ যে কী, তা ভবিষ্যতেই জানতে পারবে। তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আপাততঃ—"

"আপাততঃ কী মহারাজ?"—উৎসুক প্রশ্ন গেন্দালালের।

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ"—হুংকার ছাড়লেন ব্রহ্মচারী। অতঃপর গেন্দালাল রয়েই গেল লক্ষ্মণানন্দর আশ্রমে।

সেই আশ্রমকে কেন্দ্র করে সারা গোয়ালিয়রে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল ডজনে ডজন গুপ্তসমিতি। শাখা-প্রশাখায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ (তখনকার সংযুক্ত প্রদেশ) ও পাঞ্জাব। সর্বত্র তরুণের সমাজে সাড়া জাগল—এসেছে দেশমাতৃকার আহ্বান।"

"চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই জীবন আহবে চল,
বাজবে সেথায় রণভেরী, আসবে প্রাণে বল।"

কর্মীদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন লক্ষ্মণানন্দ—

ক-শ্রেণীর কাজ হবে গুপ্তচরবৃত্তি; খ-শ্রেণী ঘুরবে সৈন্যদলে বহাল হবার ধান্ধায় বা অন্য উপায়ে অস্ত্রশিক্ষালাভের চেষ্টায়; গ-শ্রেণীর নজর থাকবে অর্থসংগ্রহের দিকে এবং ঘ-শ্রেণী লেখনী ধারণ করবে কেতাব এবং কাগজের মাধ্যমে বিপ্লবের বাণী দেশে প্রচার করবার জন্য।

গেন্দালালের নিজের কাজ হল আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা আর 'পারা'র জঙ্গলে সমিতির সদস্যদের বন্দুক-পিস্তলের ব্যবহার শেখানো। বলা বাহুল্য, নিজে সে এ-বিদ্যাটি বহু পূর্বেই আয়ত্ত করে রেখেছে।

কিন্তু শুধু বন্দুক পিস্তলের সাহায্যে কি আর ইংরেজের ঐ রক্তবীজের ঝাড়কে মেরে শেষ করা যাবে? বোমা! নিরস্ত্র জাতির চিরকেলে ভরসা হল বোমার উপরে। তা বোমা তো কলকাতার বিপ্লবীরা এন্তার বানাচ্ছে! গেন্দালাল চলল কলকাতায়, বোমা-বানানো শিখবার জন্য। কিন্তু সেখানকার ওস্তাদেরা হুঁশিয়ার লোক তো! একজন কেউ এল, আর থলি উজাড় করে গুপ্তবিদ্যা তাকে দান করে দেওয়া হল—এমনটা রীতি ছিল না এ-কারবারে। হঠাৎ তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা সম্ভব হল না গেন্দালালের পক্ষে।

ওদিকে তার অবর্তমানে গোয়ালিয়রে কাজের বিশৃঙ্খলা হচ্ছে। বোমা-বানানোর কল্পনা শিকেয় তুলে রেখে আপাততঃ গেন্দালালকে ফিরতে হল নিজের স্থানে। অবশ্য

আশা একেবারে ত্যাগ করে গেল না। পাঞ্জাবের দিকে বাঙ্গালী সন্ত্রাসীদের আনাগোনা আছে, এটা সে জানে। এ-যাবৎ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সে করে নি, এবার করবে। তাদের হাত করতে পারলে বোমা-বানানোর পাঠশালে ঢোকা সোজা হবে নিশ্চয়ই।

গোয়ালিয়রে ফিরেই একবার নিজের এলাকাটা ঘুরে ফিরে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়ল গেন্দালাল। একদিন তাকে ঢুকতে হল ধারোয়ার জঙ্গলে। এদিকে বিশ মাইল, ওদিকে বিশ মাইল জায়গা জুড়ে এ এক মহারণ্য। গেন্দালালের অন্যতম কর্মকেন্দ্র শুভোস্তিগাঁও ঠিক এর ওপারেই। বনপথ ছাড়াও অন্য পথ আছে অবশ্য, কিন্তু সেদিক দিয়ে যেতে হলে সময় নষ্ট হবে দুটো দিন।

জঙ্গলের মাঝামাঝি এক জায়গায় বসে বনকদলীর পাতায় ছাতু ডলছে গেন্দালাল, এমন সময় একদল ডাকাত এসে ঘিরে ফেলল তাকে। গেন্দালাল একবার তাকিয়ে দেখল শুধু, তারপর "তোমাদের সর্দারকে ডেকে দাও"—বলে নিশ্চিন্দিভাবে গালে তুলতে লাগল ছাতুর ঢেলা।

একটা দৈত্যের মত মানুষ এগিয়ে এসে বলল—"কে তুমি ?"

"আমি গেন্দালাল, লক্ষ্মণানন্দ মহারাজের চ্যালা। তোমার নাম কী ?"

"পঞ্চম সিং। এই বন আমার খাস-মহল। দলের লোক ছাড়া কাউকে এখানে দেখলে আমি তাকে বলি দিই তারা-মায়ের সামনে—"

"আমিও তোমার দলের লোকই হব। কিংবা কথাটা ঘুরিয়ে নিলেই সুবিধা হয় বোধ হয়। তোমার দলটাকে আমার করে নেব। লক্ষ্মণানন্দ মহারাজকে জানো না তুমি ?"

বিরসমুখে পঞ্চম সিং বলল—"নাম জানি। শুনেছি খুব মস্ত সাধু। কিন্তু তাতে আমার কী ? কোন সন্ন্যাসীর চ্যালা হওয়ার জন্য জন্মায় নি পঞ্চম সিং—"

"সে-সন্ন্যাসী যদি আংরেজ সরকারকে দেশ থেকে হটাবার জন্য তৈরী হয়ে থাকেন, তবু নয় ?

পঞ্চম সিং অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলো—"বল কী ? কথাটা খুলে বল তো !"

বসল পঞ্চম সিং গেন্দালালের সমুখে। কলাপাতা থেকে এক ঢেলা ছাতু তুলে নিয়ে মুখেও দিল, গেন্দালাল শুরু করলো কথার ভেল্‌কি—

সেদিন পঞ্চম সিংয়েরই অতিথি হতে হলো গেন্দালালকে, সেই ধারোয়া অরণ্যে। তারা-মায়ের প্রসাদী হরিণমাংস খাইয়ে অতিথি সৎকার করল পঞ্চম সিং। তারা-মায়ের সমুখে সে আর তার দলের পাঁচশো দস্যু শপথ করেছে যে অতঃপর তারা লক্ষ্মণানন্দ মহারাজের হুকুম মেনে চলবে, আংরেজ হটাবার পুণ্যসাধনায় অংশ গ্রহণ করবে তারাও।

"আমরা ডাকু। জীবন তো যে কোন দিন যেতেই পারে আমাদের। একটা মহৎ কাজে যদি সে-জীবন যায়, তবে তো সেটা বরাতজোর বলতে হবে!" এই হলো পঞ্চম সিংয়ের উক্তি। তাতে পরিপূর্ণভাবে সায় দিল তার পাঁচশো সঙ্গী।

শুভোস্তিগাঁওয়ের তদারকি শেষ করে ধারোয়াতে আবার আসতে হল গেন্দালালকে। লক্ষ্মণানন্দর পায়ের ধূলি একবার পেতে চায় পঞ্চম সিং। তার ব্যবস্থা করতে হলে গেন্দালালের হাজির থাকা দরকার সেখানে।

লোকবল এবার অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে, শক্তসমর্থ জোয়ান পুরুষের দল। সারা মধ্যভারত তোলপাড় করে ফিরতে লাগল গেন্দালালের 'ভগোয়া পল্‌টন'। লক্ষ্মণানন্দর গেরুয়া চাদর দিয়ে পতাকা তৈরি করেছে গেন্দালাল, ছত্রপতি শিবাজী যেমন ভগোয়া ঝাণ্ডায় (গৈরিক পতাকা) পরিণত করেছিলেন গুরু রামদাসের উত্তরীয়কে। সেই পতাকার রং থেকেই গেন্দালালের দল নিজেদের নামকরণ করেছে ভগোয়া পল্‌টন।

ভগোয়া পল্‌টন যুগপৎ হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তিন তিনটি প্রদেশে। ট্রেজারি লুট হচ্ছে, অস্ত্রাগার লুট হচ্ছে। বন্দুক যা চুরি গেল এক বছরে, তার হিসাব করতে গিয়ে আংরেজের পুলিস বিভাগ চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল। "এ-অবস্থা তো চলতে দেওয়া যায় না—" রিপোর্ট গেল বড়লাটের কাছে।

নির্দেশ এল কলকাতার লাটপ্রাসাদ থেকে—"পুলিস নয়, পলটন সাজাও।"

সংযুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আর পাঞ্জাব—তিনটি প্রদেশ এক সাথে আটকে ফেল, সাগরবেড় জাল ফেলে এক একটা গোটা নদী যেমন আটকে ফেলে জেলেরা। ছেঁকে তোলো গেন্দালালের ভাগোয়া পল্‌টনটাকে—

ভাগোয়াদের কর্মকেন্দ্র যে এখন স্থানান্তরিত হয়েছে ধারোয়ার অরণ্যে, সে-খবর ইংরেজ মিলিটারির কাছে পৌঁছোতে দেরি হয় নি। তিনদিক থেকে পল্‌টন এগিয়ে আসছে ধারোয়াকে ঘিরে ফেলবার জন্য। হোক সে-অরণ্য লম্বায় বিশ মাইল চওড়ায়ও বিশ মাইল, সেটাকে ঘেরাও করার মত সৈন্যবল ভারত সরকারের আছে।

ঘিরল তারা ঠিকই, কিন্তু ঘেরাও সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে কোন্ এক গোপন রন্ধ্রপথ দিয়ে পঞ্চম সিং বেরিয়ে পড়েছে ধারোয়া থেকে। সঙ্গে গিয়েছে তার পাঁচশো অনুচর তাদের হাতিয়ারপত্র পিঠে নিয়ে।

নতুন আস্তানা হল ভিন্দের জঙ্গল। ধারোয়ার মত অত বড় নয়, তবে সমানই দুর্ভেদ্য। এখানে দুই হাজারের মত জোয়ান জমায়েত হয়েছে ভগোয়া পল্‌টনের। লক্ষ্মণানন্দ স্বয়ং উপস্থিত আছেন, ক্ষণে ক্ষণে মেঘমন্দ্র স্বরে হুংকার ছাড়ছেন—"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—

খবর পাওয়া গেল—সরকারী ফৌজ ভিন্দের দিকে আসছে। ওদেরও গুপ্তচর আছে, খবর দিয়েছে ঠিক সময়।

পালিয়ে আর কোথায় যাওয়া যাবে? এই ভিন্দেই যা হয় একটা কিছু হয়ে যাক—এস্পার বা ওস্পার। ভগোয়া পল্‌টনকে তিনভাগে বিভক্ত করা হল। লক্ষ্মণানন্দ, গেন্দালাল, পঞ্চম সিং—এক একজন নিলেন এক একভাগের নেতৃত্ব। অরণ্যের তিন দিকে রইল তিন ভাগ, বাকী উত্তর দিকটা শুধু, সেদিক দিয়েই শত্রু আসছে, তাদের পথের উপর দাঁড়াবার দরকার নেই। সম্মুখ সমর কথাটা শুনতেই ভাল, কিন্তু দুর্বল পক্ষের ওটা এড়িয়ে যাওয়াই কর্তব্য।

নিশুতি রাত, গুটি পাঁচেক সহচর সঙ্গে নিয়ে গেন্দালাল রোঁদে বেরুলো। ঝোপের ভিতর থেকে কে একজন হাঁচল না? নিশ্চয় সরকারী ফৌজ। অরণ্যে ঢুকেছে তারা। টহলদারেরা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে বুঝি।

গেন্দালাল নিঃশব্দে পিছিয়ে গেল। লক্ষ্মণানন্দর সঙ্গে নিরিবিলিতে পরামর্শ করল খানিক, তারপরে ডেকে পাঠাল পঞ্চম সিংকে। বুহরচনার কৌশল পেশ করল গেন্দালাল। সেই অনুসারেই জোয়ানদের সাজিয়ে ভোরের আলোর প্রতীক্ষায় রইল ভগোয়া পল্‌টন। এ ফাঁকা মাঠ নয় যে রাত্রেও যুদ্ধ করা চলবে, নিবিড় অরণ্যে এখানে তো নিজের হাত-পাগুলোই চোখে দেখা যায় না, যুদ্ধ কেমন করে হবে?

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি পূর্বাকাশে, 'হর হর শঙ্কর' আর 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল ভিন্দের অরণ্যে। তার উত্তরে ইংরেজ দাগল কামান। ছোট ছোট কামান তারা এনেছে কয়েকটা। জঙ্গলটাই নিশ্চিহ্ন করে দেবার মতলব তাদের।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর, বীর ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণানন্দর তখন মৃত্যু হয়েছে, তাঁর মাথাটাই উড়ে গিয়েছে কামানের গোলায়। গেন্দালালের দেহে আঠারোটা গুলি রাইফেলের, ডান চোখের মণিটা পর্যন্ত গলে গিয়েছে। হতাহত পাঁচশোর উপরে। পঞ্চম সিং নিজেও তাদের ভিতরে।

গেন্দালালকে বন্দী করে এনে জেলখানায় তোলা হল। চিকিৎসায় তাকে বাঁচিয়ে তুলল ইংরেজ সরকার, ফাঁসির মঞ্চে ঝোলাবার সদুদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু গেন্দালালকে চেনে না তারা। সুরক্ষিত কারার ডবল প্রাচীর টপকে পালিয়ে গেল গেন্দালাল। জীবনে আর তাকে ধরতে পারল না ইংরেজ।

বহুদিন পরে তার নিভৃত পল্লীগৃহে বসে তার স্ত্রী একটা খবর পেল—গ্রামপ্রান্তের

ভগ্ন মন্দিরে গেন্দালাল পড়ে আছে—সাংঘাতিক পীড়িত। স্ত্রী ছুটে গেল স্বামীর কাছে, ছদ্মনামে স্বামীকে নিয়ে ভর্তি করল নিকটবর্তী শহরের হাসপাতালে। চিকিৎসা চলতে লাগল—

ইতিমধ্যে পুলিসের কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছে যে ভানপুর হাসপাতালের নূতনতম রোগীটি ছদ্মবেশী গেন্দালাল ছাড়া আর কেউ নয়। ছুট! ছুট! সদলবলে ছুটতে ছুটতে এসে পুলিসসাহেব দেখলেন—

হাসপাতালের খাটিয়ায় পড়ে আছে গেন্দালালের মৃতদেহ।

গেন্দালালের স্ত্রী একটা চিরকুট দিল পুলিসসাহেবের হাতে, তাতে ইংরেজীতে লিখে গিয়েছে গেন্দালাল—"ক্রমওয়েলের লাশ তোরা কবর থেকে তুলে ফাঁসিতে লটকেছিলি, আমার লাশ তো জমিনের উপরেই আছে, ছাড়বি কেন?"

মজার ছবি

ওরে খোকা! উঠিসনি রে,
নয়তো ওটা হিমালয়,
দুম করে দাদুর ভুঁড়ি
ফাটলে উড়ে যাবি নিশ্চয়।

জীবন-মৃত্যুর লটারি

[আর্থার সি. ক্লার্ক-এর "ব্রেকিং স্ট্রেইন" অবলম্বনে]

শ্রীবৈজ্ঞানিক

"সর্বনাশ হয়ে গেল ক্যাপ্‌টেন—"

সশব্দে দরজা খুলে ইঞ্জিনিয়ার ম্যাকনিল ককিয়ে উঠল—"সর্বনাশ হয়ে গেল ক্যাপ্‌টেন! সব অক্সিজেন বেরিয়ে গেছে চৌবাচ্চা থেকে।"

ডেস্কে বসে দিনপঞ্জী লিখছিল গ্রাণ্ট, চমকে উঠল। চেহারা পিছন পানে ফেরানো সহজ নয়, কারণ চামড়ার দড়ি দিয়ে কোমর বাঁধা আছে চেয়ারের সঙ্গে। অগত্যা ঘাড়টাই ফেরালো শুধু—"বেরিয়ে গেছে? কী করে বেরুবে?" ভয় আর সংশয় এক সঙ্গে মেশানো তার প্রশ্নে।

"উল্কা!"—বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীর ফাঁকে যেটুকু ব্যবধান দেখাল ম্যাকনিল। বড়জোর তা ইঞ্চিখানিক হতে পারে—"এতটুকুন উল্কা, দশ গ্রামের বেশী ওজন হবে না তার, বিমানের দেয়াল ফুটো করে ঢুকে পড়েছে অক্সিজেনের ট্যাঙ্কে।"

কোমর থেকে পেটি খুলে উঠে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্তেন। বেঁধে ছেঁদে নিজেকে বসিয়ে রাখা যায় যতক্ষণ, একটু তবু ভারী-ভারী লাগে দেহটাকে। উঠে দাঁড়ালে তো তুলোর মত হালকা। ভেসেই উঠবার কথা। যদি-না দেয়াল বা দরজা বা আসবাবপত্র আঁকড়ে ধরা যায়। আসবাব? প্রত্যেকটা জিনিসই স্ক্রু দিয়ে আঁটা মেজের সঙ্গে, নইলে তাদেরও ভেসে বেড়াবার বাধা নেই।

বিমান তো সিন্দুক-বিশেষ। 'এয়ার-লক্' কামরাটাই হল বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ। ওর দরজা বন্ধ করে দাও, ব্যস, মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থাতেও তোমার বিমান মহাশূন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

সেই দরজার পাশেই অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক। দেয়ালে সাঁটা। একপলক দেখে কিছু বুঝবার জো নেই। গ্রাণ্টের মাথার উপরেও তিন ইঞ্চি পরিমাণ খাড়াই। হালে-লাগানো লাল রং ঝকঝক করছে সারা গায়ে। সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে কোন খুঁত হওয়ার কথা নয় এই দুর্ঘটনার দরুন, হয়ওনি তা।

তবে ঐ কাঁটাটা! মজুদ অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দেশ করে যেটা। সেটা এই মুহূর্তে স্রেফ জিরোর ঘরে। জিরো! শূন্য! কিছুমাত্র সঞ্চয় নেই ভাঁড়ারে। নিঃশেষে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ঐ বিশাল ট্যাঙ্ক।

করবার কিছু আছে কি ? কিছু না। কাপ্তেন তাকায় ইঞ্জিনিয়ারের দিকে, ইঞ্জিনিয়ার তাকায় কাপ্তেনের দিকে। দু'জোড়া চোখে অগাধ নৈরাশ্য।

নৈরাশ্য ? অবশ্যই আসতে পারে নৈরাশ্য। কিন্তু তা বলে এ কী ?

অর্থাৎ ম্যাকনিলের এ হল কী ? লোকটার মুখের দিকে এতক্ষণ ভাল করে তাকাবার ফুরসুত হয়নি গ্রাণ্টের। কিন্তু এইবার—

তাকাতে গিয়েই কাপ্তেনের মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। নৈরাশ্য থাকতে পারে, কিন্তু মুখে-চোখে আতঙ্কেরও সুস্পষ্ট আভাস। ও-রকমটা থাকবে কেন ? মৃত্যুভয় ? সৌরমণ্ডলে পাড়ি জমানো যাদের দৈনন্দিন কাজ, তারা করবে জীবনের মায়া ? অবশ্য এযুগে মহাকাশ-পর্যটনে দুর্ঘটনা ঘটবার কোন উপায় নেই, তবু দৈবাৎ কিছু ঘটে গেলে তা থেকে পরিত্রাণেরও তো কোন রাস্তা এ-যাবৎ কেউ বাৎলাতে পারে নি ! সেই দৈব, লক্ষ জনকে যা এক নাগাড়ে সবুজ সংকেত দেখিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যের অচিহ্নিত রাজপথে, তা যদি হঠাৎ নিষ্করুণ হয়ে লাল আলো বাগিয়ে ধরে কোন এক ভাগ্যাহত বৈমানিকের মুখের উপরে—

তাহলে তার আর নিস্তার নেই, তা জানে সব বৈমানিকই। জানে এই ম্যাকলিনও। তবে তার কেন এই আড়ষ্ট মুহ্যমান অবস্থা, সংকটের আভাসমাত্র পেয়েই ?

সুস্পষ্ট ঘৃণার চোখে গ্রাণ্ট তাকিয়ে রইল ম্যাকনিলের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ। ম্যাকনিল মাথা নীচু করেছে সে-দৃষ্টির সমুখে। তাকে কোন কথা না বলে গ্রাণ্ট চলে গেল কনট্রোল কামরায়। চেয়ারে বসে আবার চামড়ার দড়ি দিয়ে নিজেকে বাঁধল। এই ভাবে বসেই কাজ করতে অভ্যস্ত গ্রাণ্ট। কাজ করতে এবং চিন্তা করতে।

চিন্তা ? অনেক। ম্যাকনিল যদি মগজের দিক দিয়ে সুস্থ থাকত, আলোচনা করা যেত তার সঙ্গে। ভীতু হোক, যাই হোক, ওয়াকেবহাল লোক, তাতে তো আর সন্দেহ নেই। আন্তগ্রহ-পথের বিমানে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া তো আর তিন তুড়িতে মেরে দেওয়ার কাজ নয় ! বহু লেখাপড়া, বহুদিনের শিক্ষানবিসীর ফলে তবেই কেউ পেতে পারে এই গুরুদায়িত্বের পদ।

ম্যাকনিল জানে সব। কিন্তু এ-মুহূর্তে ওর সঙ্গে কথা কওয়া ঝকমারি মাত্র। বিভীষিকায় আড়ষ্ট হয়ে আছে ও। জ্ঞানবুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে আছে ওর। কিছু বলতে গেলেই আবোল-তাবোল বলবে।

কাজেই আলোচনা থাকুক। কর্তব্যনিরূপণের দায়িত্ব গ্রাণ্টেরই, গ্রাণ্টই করবে তা।

এই "স্টার কুইন" পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহে যাতায়াত করছে আজ পাঁচ বছর। যেতে পাঁচ মাস লাগে, আসতে পাঁচ মাস। শুক্রে পৌঁছানোর পরে একমাস বিশ্রাম, পৃথিবীতে

পৌঁছোনোর পরেও একমাস। সাকুল্যে বছরে একবার যাওয়া, একবার আসা। যাত্রী-বিমান নয় স্টার কুইন, স্রেফ মাল বওয়াই ওর কাজ।

যাত্রীবহনের জন্য অন্য জাতীয় বিমান আছে, তাদের গতিবেগ তিনগুণ বেশী, তাতে জ্বালানি খরচা দশগুণ। মাল-জাহাজের মত অমন ধরা-বাঁধা সময়সূচিও নেই তাদের যাতায়াতের। কারণ, যাত্রীচলাচল কমই হয়। দ্বাবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পৃথিবীর মানুষ যখন প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে শুক্রগ্রহে, একসাথে হাজার দুই পুরুষ তখন গিয়েছিল সেখানে। মোটামুটি ঐরকম সংখ্যাই এখনও রয়েছে। কিছু মরেছে, কিছু ফিরেছে, আবার নতুন কিছু আমদানীও হয়েছে পৃথিবী থেকে। নবাগতদের ভিতর নারীর অনুপাত চারজনে একজন।

শুক্রের বাসিন্দারা বসে থাকে না, খাটে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। গোটা গ্রহটারই জঠর বিবিধ খনিজ পদার্থে ভর্তি। পৃথিবীতে একদম পাওয়া যায় না, এমন খনিজও আছে অনেক। সেই সব তোলা এবং পৃথিবীতে চালান দেওয়াই ওদের কাজ। স্টার কুইন-জাতীয় বিমানেরা প্রতি ক্ষেপেই পৃথিবীতে টেনে আনছে শত শত টন।

এসব বিমানে সাধারণতঃ তিনটি করে লোক থাকে, কাপ্তেন, সহকারী কাপ্তেন ও ইঞ্জিনিয়ার। গ্রাণ্টের আসবার কথা ছিল সহকারী হিসেবে। হঠাৎ যাত্রা শুরুর কয়েক ঘণ্টার আগে সেই ভদ্রলোক এক দুর্ঘটনায় পড়ে গেলেন, কাপ্তেন হয়ে যাঁর আসার কথা ছিল, পা ভেঙ্গে গেল আছাড় খেয়ে। অল্প সময়ের মধ্যে অন্য একজন মহাকাশচারী কাপ্তেন জোটানো সম্ভব নয়, অগত্যা গ্রাণ্টকেই কাপ্তেন করে পাঠালেন কর্তারা।

তিনজনের কাজ দুইজনে করতে হবে শুনে গ্রাণ্ট আর ম্যাকনিল—দুইজনেই গোড়ায় বেঁকে বসেছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ যখন ভগ্নজানু কাপ্তেনের মাইনেটা ওদের দু'জনের ভিতরেই ভাগাভাগি করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন তারা রাজীই হয়ে গেল সাত-পাঁচ ভেবে।

সাত-পাঁচ তারা ভেবেছিল, কিন্তু সাত-পাঁচের উপরেও যে ভাববার অন্য কিছু থাকতে পারে, তা খেয়াল হয় নি তাদের। কর্তৃপক্ষেরও হয় নি। সেই অন্য-কিছুটা হল এই যে তিনটি লোক এক জায়গায় থাকলে তাকে সমাজ বলা যায়, কিন্তু দু'টি থাকলে তা যায় না। এবং যেহেতু মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব, দুটি লোক পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন একান্ত নিভৃতে বাস করতে বাধ্য হলে তাদের জীবনযাত্রাই ঘোরতর অস্বাভাবিক হয়ে ওঠার একটা আশঙ্কা আছে।

নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এই বৃহৎ আশঙ্কা মাথায় নিয়েই গ্রাণ্ট আর ম্যাকনিল আজ একশো কুড়িদিন অপার মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়ে আসছে, মনের আনন্দে না হোক,

অন্ততঃ নিরাপদে। আর মাত্র ত্রিশটা দিনের পথ বাকী। এই সময়ে বাধল এই বিপত্তি। একান্ত অপ্রত্যাশিত বিপত্তি, এক মিলিয়নের ভিতরে একটা মাত্র বিমানের ভাগ্যে যে-বিপত্তি ঘটলেও ঘটতে পারে বলে গ্রহবিজ্ঞানীরা যুগ যুগ ধরে সুদৃঢ় মত প্রকাশ করে আসছেন।

উল্কা? মহাশূন্যের কোন্ অংশে কোন ঋতুতে উল্কার চলাচল কী পরিমাণে হবে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে তার নির্ভুল চার্ট তৈরি করা হয়েছে। এ-সময়ে পৃথিবীর কক্ষ থেকে শুক্রের কক্ষে যাওয়ার পথে স্টার কুইনের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উল্কার এই যে সংঘাত, এটাকে নেহাতই ভগবানের মার ছাড়া অন্য কিছু তো বলার উপায় নেই!

যা হোক, গ্রাণ্ট যখন কাপ্তেন, আর ম্যাকনিলের মত খরগোশের প্রাণ নিয়ে যখন সে বিমান চালায় না, তখন তার করণীয় আছে অনেক কিছু এক্ষেত্রে। পৃথিবী অনেক পিছনে, সে-তুলনায় শুক্র হাতের নাগালে বললেই হয়। কণ্ট্রোল রুম পৃথিবীতেও আছে, শুক্রেও আছে, যেখানে বসে মহা মহা বিশেষজ্ঞেরা নির্দেশ, উপদেশ এবং আদেশ দেন শূন্যচর বিমানদের। শুক্রের কণ্ট্রোলে খবরটা দেওয়াই প্রথম কর্তব্য এখন।

ট্রান্সমিটার সুইচবোর্ডে বৈদ্যুতিক সংকেত বেজে উঠল। শুক্রের পিঠে আর্কল্যাম্প জ্বলছে সূর্যের মত দীপ্তি নিয়ে। আর এখানে স্টার কুইনের বাইরের কাঠামোতে খাটানো আছে অর্ধবৃত্তাকার আয়না। সে-আয়নার মুখ ঐ আর্কল্যাম্পের দিকে ফেরানো। দূরত্ব? দুটোর ভিতরে এই মুহূর্তে দশ মিলিয়ন কিলোমিটারের মত। বিমান থেকে শব্দের ঢেউ আধ মিনিটে পেরিয়ে যাবে দূরত্বটা।

শুক্রের স্বয়ংক্রিয় নির্দেশক যন্ত্র থেকে উত্তর এল—"বলুন"—

গ্রাণ্ট ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল। ভয় আর নৈরাশ্যের আবেগকে যথাসম্ভব দূরে ঠেলে রেখে। পরিস্থিতিটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলল, তারপর জানতে চাইল—"এখন আমার কর্তব্য কী?"

গ্রাণ্টের রিপোর্ট শুক্রের নির্দেশক-যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে, এখন কিছুক্ষণ তো ফিল্মটা নাড়াইয়ে জড়ানোই থাকুক! যথাসময়ে সংকেতপাঠক কেউ আসবে, পড়বে, চমকে উঠবে অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ পেয়ে, তারপর যথাসময়ে বসবে বিশেষজ্ঞদের সভা, তারপর আসবে উপদেশ—

যদি অবশ্য দেবার মত উপদেশ কিছু থাকে ওদের।

আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পরে গ্রাণ্ট দেখল—দেবার মত উপদেশ সত্যিই কিছু নেই কণ্ট্রোলের। বৈমানিক দু'জনের নিরাপত্তা কোন্ দিক থেকে আসতে পারে, তা ওঁরা ঠাউরে উঠতে পারেন নি এখনো। তবে ভেবে দেখছেন, বিশেষ করেই ভেবে দেখছেন এবং আশাও করছেন যে অচিরেই একটা সহজসাধ্য উপায় পারবেন তাঁরা বাতলে দিতে।

উপস্থিত তাঁরা বৈমানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান স্টার কুইনের খোলে মজুদ মূল্যবান মালগুলোর উপরে। ওগুলো যেন কোনমতেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, কোনরকম পরিস্থিতিতেই। শুক্রগ্রহের উন্নয়ন পরিকল্পনায় একান্তভাবে অপরিহার্য কতকগুলি জিনিস এবারে চালান হয়ে আসছে পৃথিবী থেকে। গুরুতর ক্ষতি হবে সেগুলি মারা পড়লে। তাছাড়া ওখানকার বাসিন্দাদের নিত্যব্যবহারের গেরস্তালি জিনিস হাজারো রকমের। সেসব ঠিকমত না পৌঁছোতে পারলে ত জীবনযাত্রাই অচল হয়ে পড়বে মানুষগুলোর!

কথা বন্ধ হল ওদিককার। গ্রাণ্ট মুখ বিকৃত করলে একবার। যত চিন্তা ওদের ঐ মালগুলোর জন্য। মানুষ দুটোর চাইতে মালের মূল্য বেশী। আর্থিক হিসাবে বেশী যে, তা অবশ্য গ্রাণ্টও অস্বীকার করে না। কারণ, ওসব তো ইন্‌সিওর করাই রয়েছে দুই মিলিয়ন ডলারে! গ্রাণ্ট আর ম্যাকলিন কি আর দুই মিলিয়নে বিকোবার মত দামী চীজ? কদাপি না!

কিন্তু দামী চীজ শুক্রের বাছাধনেরা হাতের মুঠোয় পাচ্ছেন কী ভাবে? যদি কমদামী এই নরাধম দুটো মারাই পড়ে বেঘোরে? এ কথাটা ঠিক যে জাহাজটা মারা পড়বে না, অন্ততঃ এক্ষুণি না। কিন্তু শুক্রে তো সে নামবেও না! নামাবে কে? যদি কাপ্তেন ইঞ্জিনিয়ার মারাই যায়? ঠিক সময়ে ঠিক যন্ত্রটি টিপলে তবেই তো ঠিক জায়গায় ভিড়তে পারে বিমান! সেই টেপার কর্মটি করছে কে?

কেউ করছে না। সুতরাং নিজের গতিপথে স্টার কুইন অপ্রতিহত বেগে ছুটতেই থাকবে। শুক্রকে বাঁয়ে ফেলে রেখে অনন্ত শূন্যে সে উধাও হয়ে যাবে, উড়তে থাকবে যতদিন না জ্বালানি ফুরিয়ে যায়। তা যখন ফুরোবে, তখন হয় কোন গ্রহের চারদিকে আবর্তিত হতে থাকবে উপগ্রহের মত নিজের একটা স্বতন্ত্র কক্ষপথ তৈরি করে নিয়ে। আর নয় তো পড়বে আর গুঁড়ো হয়ে যাবে—কোথায় তা কেউ বলতে পারে না।

শুক্র থেকে কোন বিমান হয়ত বেরিয়ে আসতে পারে মহাশূন্যের বুকেই স্টার কুইনকে পাকড়াবার জন্য। সে-চেষ্টা তো বিফল হতে বাধ্য। সফল হতে হলে তার জন্য চাই স্টার কুইনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা। সে-সহযোগিতা তো বিমানে করতে পারে না, পারে বৈমানিক। কিন্তু বৈমানিক তো ততদিনে গতাসু!

মাল! মালের নিকুচি করেছে! চুলোয় যাক মাল!

হঠাৎ মাথা ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে বসল গ্রাণ্ট।

চুলোয়? হ্যাঁ, চুলোয় যাবেই নিশ্চয়। কিন্তু গ্রাণ্ট যতক্ষণ বেঁচে বর্তে আছে, ততক্ষণ সে এটা দেখতে বাধ্য যে থানে-থান বজায় থাকে ওগুলো। তারপর যা হবার, তা হোক, তার জন্য গ্রাণ্ট দায়ী নয়। যাবৎ জীবিতব্য, তাবৎ কর্তব্য।

গ্রাণ্ট উঠে দাঁড়িয়ে মালখানার দিক এগুলো।

পাঁচশো বছর আগেকার, অর্থাৎ বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর সেকেলে বিমান নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁদের চোখে পঞ্চবিংশ শতাব্দীর এই স্টার কুইনের আকারটাই বেয়াড়া ঘিটকেল ঠেকবে। এর মাঝখানটা ঠিক যেন মোটা চোঙ্গ একটা, একশো গজ লম্বা। এর দুই মাথায় দুটো চতুষ্কোণ অংশ, একটা বড়, একটা ছোট। ছোট অংশটাতেই কলকব্জা ইঞ্জিন ইত্যাদি, এয়ারলক এবং অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। বড়টাতে কণ্ট্রোলরুম এবং বৈমানিকদের বাসস্থান।

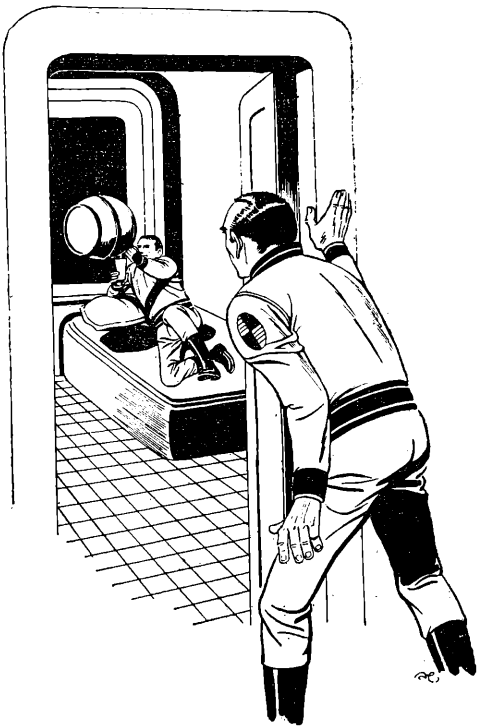

অন্য হাতে গেলাস ধরেছে সেই নরনীচে। [পৃষ্ঠা ২৭০

কণ্ট্রোলের পাশেই কাপ্তেনের ঘর, এটা তালাবন্ধ! কারণ এ-যাত্রায় স্টার কুইনে যাঁর কাপ্তেন হয়ে আসার কথা ছিল, তিনি আসেন নি। তার পাশে পর পর গ্রাণ্টের ও ম্যাকনিলের ঘর। ম্যাকনিলের ঘর পেরুলেই একশো গজ লম্বা সেই চোঙ্গ। ঐ চোঙ্গই মালখানা।

তিনখানা ঘরের সামনে দিয়েই ঢাকা বারান্দা, সেই বারান্দার প্রান্তে মালখানায় ঢোকার দরজা। গ্রাণ্ট দেখে অবাক্, সে দরজা খোলা।

মালখানার দরজা খোলা কেন? অবশ্যই ম্যাকনিল খুলেছে।

কেন খুলবে এ সময়? খুলে যদি ও-মাথায় ইঞ্জিন ঘরে গিয়ে থাকে, তাহলে তো ও-দরজা ওপিঠ থেকে বন্ধ করে যাওয়া উচিত ছিল!

ম্যাকনিলের কথা ভাবতে গিয়েই পাশের দিকে দৃষ্টি পড়ল গ্রাণ্টের, ম্যাকনিলের ঘরের পানে। তার দরজাও বন্ধ নয়, আধ-খোলা। সেই ফাঁক দিয়ে আশ্চর্য জিনিস চোখে পড়ল—একটা পিপে ভাসছে হাওয়ায়। ম্যাকনিলের বিছানার পাশে। অভিকর্ষ দুর্বল বলে যে-কোন জিনিসেরই উপর পানে ভেসে ওঠবার ঝোঁক থাকে, মহাশূন্যের এই স্তরে। সুতরাং পিপে ভাসছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আশ্চর্য ঠেকল যে-জিনিসটা তা হল ইঞ্জিনিয়ার মশাইয়ের কাণ্ডকারখানা: পিপেটা ঠিক হাতের নাগালেই ম্যাকনিলের। বিছানায় আধশোয়া অবস্থাতেই সে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পিপের দিকে। এক হাতে নল খুলে দিয়ে অন্য হাতে গেলাস ধরেছে সেই নলের নীচে। কুলকুল করে সোনালী মদ গড়িয়ে পড়ছে গেলাসে। দেখতে দেখতে ভরে উঠল সেটা, তখন নল বন্ধ করে গেলাস মুখে তুলল ম্যাকনিল।

ক্রোধ আর ঘৃণা এমন সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল গ্রাণ্টের চোখে মুখে যে ম্যাকনিল সোজা হয়ে বসে একটা জবাব দিতে বাধ্য হল—"মরতেই যখন হবে, তখন শেষ সময়টা একটু আরামেই কাটাতে চাই।"

"নিজের পয়সায় মদ কিনে আরাম করলে আমার কিছু বলবার থাকতো না। ঐ পিপেটা আমারও নয়, তোমারও নয়। পৃথিবী থেকে চালান হয়ে যাচ্ছে শুক্রের উপনিবেশীদের কাছে। দাম দেবে তারাই, বা আগেই দিয়ে রেখেছে। সুতরাং আরামের লোভে যে-কাজটি তুমি করে বসেছ, তা হচ্ছে স্রেফ চুরি।"

ম্যাকনিল অন্যায় করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য সহকর্মী লোকটা, সুযোগ্য অভিজ্ঞ বৈমানিক একটা, তাকে চট্ করে চোর বলে বসাও কম অন্যায় হয় নি গ্রাণ্টের। দোষ কিন্তু গ্রাণ্টের নয়, দোষ হল এই পরিস্থিতিটার। পৃথিবীর মহাকাশ কণ্ট্রোল দুটি মাত্র লোককে স্টার-কুইনে পুরে পাঁচ মাসের বিপজ্জনক পথ-পরিক্রমায় পাঠিয়েছেন। এটা হিসাব করে দেখেন নি যে দু'খানা কাঠে অনবরত ঘষা লাগতে থাকলে তা থেকে আগুনও বেরুতে পারে, যদি-না মাঝেমাঝে জল ঢালবার জন্য মধ্যস্থ কেউ থাকে। এ ক্ষেত্রে নেই, গ্রাণ্ট ম্যাকনিলের ভিতরকার সম্পর্ক আগে থেকেই দিনের দিন তিতো হয়ে আসছিল, এই অক্সিজেন-ট্যাঙ্কের ঘটনাটা হঠাৎ ঘটে যাওয়ায় সেই তিক্ততা এক এক লাফে একেবারে হিংস্রতার পর্যায়ে চড়ে বসেছে।

ম্যাকলিন অবশ্য দপ করে জ্বলে উঠল না চোর অপবাদ শুনে। জ্বলে-ওঠার মত স্বভাবই তার নয়। "ও তো এখন বেওয়ারিশ মাল—" বলল সে—"শুক্রে পৌঁছোবে—অমন আশা থাকলে আমি ওতে হাত দিই?"

ওর কণ্ঠ বাঘের মত গর্জাচ্ছে না বটে, কিন্তু সাপের মত হিসহিস করছে।

"ও মাল শুক্রে পৌঁছোবে না। এমন কথা ভাববার সময় এখনও আসে নি। হয়ত তুমিই দেবে পৌঁছে—" এই কথা বলতে বলতে ভাসমান পিপেটাকে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে মালখানার দিকে নিয়ে গেল গ্রাণ্ট।

কথাটা গ্রাণ্ট অবশ্যই ঠাট্টা করে বলেছিল ম্যাকনিলকে। নিষ্ঠুর ঠাট্টাই বটে। কিন্তু সে-নিষ্ঠুরতাটা উপলব্ধি করার পরেও তা নিয়ে চিন্তা করার সময় পেল না গ্রাণ্ট।

মুখ দিয়ে তার এ কী কথা বেরুলো? সে শুধু এই কথাই ভাবছে, চোঙ্গের ভিতর এধার-ওধার ঘুরতে ঘুরতে। ম্যাকনিলই হয়ত পৌঁছে দেবে—বলেছে ও। এ কী দৈববাণী? অসম্ভব কী?

দাঁড়াও। হিসাব করি আগে। ট্যাঙ্ক ফেটেছে, তাতে আর এক কণাও অক্সিজেন নেই। তবু বেঁচে আছি এখনও। ম্যাকনিল আর আমি দু'জনই বেঁচে আছি। তার কারণ, এই বিমানের হাওয়া এখনও নিশ্বাস নেওয়ার অযোগ্য হয়ে ওঠে নি। পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আসার সময় যে বিশুদ্ধ বাতাস ভরে এনেছিল জঠরে, তা তত বিশুদ্ধ না থাকলেও এখনও মারাত্মক হয়ে ওঠে নি মানুষের পক্ষে। কারণ, এতদিন পর্যন্ত প্রতিদিনই ট্যাঙ্ক থেকে নতুন অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়েছে বিমানের বাতাসে।

ভারমান পিপেটাকে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে মালখানায় নিয়ে গেল গ্রাণ্ট। [পৃষ্ঠা ২৭০

তাছাড়াও কলুষিত বাতাস বিশুদ্ধ করে নেবার যন্ত্র আছে বিমানে। সে তার কাজ করে যাচ্ছে ক্রমাগত। নিশ্বাসের সঙ্গে যে দূষিত বাষ্প মানবদেহ থেকে বেরুচ্ছে। তা নিষ্ক্রিয় করে দেবার মত ক্ষমতা আছে সে রি-জেনারেটরের। দূষিত জিনিসটা নষ্ট করে দিতে গিয়ে অবশ্য বাতাসের অক্সিজেন অংশটা ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে-ক্ষয় খুব দ্রুত নয়, হঠাৎ তার দরুন শ্বাসরোধ হওয়ার আশঙ্কা নেই। শ্বাসকষ্ট অবশ্য এখন শুরু হবে, দুই এক দিনেই হবে, কিন্তু শ্বাসরোধের পর্যায় আসতে দেরি আছে।—কত দেরি?

কণ্ট্রোলে পৌঁছে গ্রাণ্ট আঁক কষে বার করল—কুড়ি দিন দেরি। কুড়ি দিন পরে আর এই বিমানে নিশ্বাস নিতে পারবে না কোন মানুষ।

গ্রাণ্ট আর ম্যাকনিলের জীবনের মেয়াদ তা হলে কুড়িদিন। অথচ শুক্র রয়েছে ত্রিশ দিনের দূরত্বে। দশটা দিনের ফারাক। মাত্র দশটা দিন।

দাঁড়াও। দুইজন লোক শ্বাস নিচ্ছে, ছাড়ছে। দূষিত বাষ্প বেরুচ্ছে দুটো দেহ থেকে। তাতেই কুড়ি দিন লাগবে বাতাসটার পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে।

কিন্তু দুটো না হয়ে দেহ যদি একটা হয়? একটা মাত্র মানুষের শ্বাস যদি কলুষিত করতে থাকে বাতাসটাকে?

তাহলে অবশ্য বাতাস আরও অনেকদিন নিশ্বাস নেওয়ার যোগ্য থাকবে। আবার খানিকটা আঁক কষল গ্রাণ্ট। ঠিক আছে। একজন যদি থাকে বিমানে, এই বাতাসই তাকে ত্রিশ দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।

গ্রাণ্ট সারারাত ভাবল। না। লটারি নয়। ম্যাকনিলের সঙ্গে লটারি। যে বিপদের মুখে পড়লে ভয়ে কাঁপে? যে ভয় তাড়াবার জন্য পরের মদ চুরি করে খায়? যীশু কহো! লটারি হয় সমানে সমানে! চক্ষু বুজে তাসের গাদা থেকে তুমি একটা তাস তুলে নাও, আমি একটা তাস তুলে নিই। যে বড় তাস তুলবে, সে বেঁচে থাকবে, যে ছোট তুলবে—

না, ওসব নয়। ওসব হয় সমানে সমানে। ঐ ভীতু, ঐ চোর, ম্যাকনিলের সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর লটারি করতে পারে না গ্রাণ্ট। তা ছাড়া, লটারিতে ঝুঁকি আছে, ও হয়তো সে-ঝুঁকি নিতেও চাইবে না। দরকার কী? জীবনটা ওকে ভিক্ষাই দিয়ে যাবে গ্রাণ্ট।

পরের দিন ও শুক্রের কণ্ট্রোলকে ডেকে বলল—"ম্যাকনিল বিমান নিয়ে যাচ্ছে। দু'জনের বাঁচা সম্ভব নয়, কাজেই আমি স্টার কুইন থেকে নেমে যাচ্ছি—"

"সে কী? সে কী? সে কী?"—এ ব্যাকুল প্রশ্নের আর জবাব পেলে না শুক্রের কণ্ট্রোল।

সন্ধ্যাবেলায় ম্যাকনিলকে ডেকে নিয়ে গ্রাণ্ট এয়ার লক খুলে দাঁড়াল। গ্রাণ্টের পিঠে একটা রকেট বাঁধা। রকেটের ধাক্কা খেয়ে দূরে গিয়ে না পড়লে দেহটা বিমানের পাশে পাশে ভাসতে ভাসতে চলতে থাকবে, এমন একটা আশঙ্কা আছে।

"এই রকেটে আগুন দিয়ে দাও, তারপর এয়ার লক বন্ধ করে গিয়ে কণ্ট্রোলে বসো। ত্রিশ দিনের দিন শুক্রে পৌঁছোবে, ইতিমধ্যে ওদের মদগুলো সাবাড় করে দিও না—" বলল গ্রাণ্ট।

ম্যাকনিল গুম হয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, একবার বুঝি পিছিয়ে এসে ভিতরে ঢুকে পড়বার চেষ্টাও করল, কিন্তু তক্ষুণি সে এক ধমক খেলো গ্রাণ্টের "ভীতু, অপদার্থ" বলে। তারপরই দৃঢ় পদে এগিয়ে এসে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধরিয়ে দিল ফিউজে।

শৈলেশ ভড়

সে এক দারুণ উত্তেজনাময় রাত।

হ্যাঁ, অস্কার হ্যামারস্টেইনের জীবনে তখন 'কী হবে, কী হবে' ভাব। সময় যেন আর কাটতে চায় না। মুহূর্তগুলো সব ঘণ্টার মত লম্বা হয়ে গেছে।

তারপর একসময় সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারে প্রদর্শনী শুরু হবার ঘণ্টাটি বেজে উঠলো।

আর সেটা যখন থামলো তখন প্রেক্ষাগৃহের আলোগুলি একটু একটু করে নিবতে শুরু করেছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে কাচের মধ্য দিয়ে হ্যামারস্টেইন দেখলেন প্রেক্ষাগৃহ আজ পরিপূর্ণ। একটি চেয়ারও খালি নেই কোথাও। আর যে সব মুখগুলি এতক্ষণ উজ্জ্বল আলোয় জ্বলজ্বল করছিলো সেগুলো ক্রমেই অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে আসছে।

একটা অনিশ্চিত উত্তেজনায় হ্যামারস্টেইনের বুক কাঁপছে—কী জানি কী হয়।

যৌবনের প্রথম দশটি বছর তিনি গীতিনাট্য লিখে সুনামের ধাপে ধাপে উঠে আসছিলেন। তারপর হঠাৎ কী যে হল গত এগার বছর ধরে তিনি কেবলই বিফল হচ্ছেন। নাটক, গান কোনটাই লোকে নিচ্ছে না।

তবু তিনি হতাশ হন নি। তিনি জানতেন ব্যর্থতাই সাফল্যের সুদৃঢ় স্তম্ভ। তিনি ছিলেন সাধক। তাই সাধনার পথ থেকে এতটুকু ভ্রষ্ট হন নি। রচনা সৃষ্টি করে চলেছেন একমনে।

সম্মানের চূড়া থেকে মানুষ যখন পড়ে যায় তখন যে তার কী মর্মান্তিক মনোবেদনা কী শোচনীয় মানসিক অবস্থা হয়, সে ব্যথা যার না হয়েছে সে বুঝতে পারবে না। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের সাধক তাঁরা কখনো আশা ছাড়েন না।

অস্কার হ্যামারস্টেইন ছিলেন সেই ধরনের মানুষ।

প্রেক্ষাগৃহের সব আলোগুলো যখন নিবে গেলো, অন্ধকারের কালো যবনিকা যখন নেমে এলো হলের মধ্যে তখন হ্যামারস্টেইন নিঃশব্দে দরজা খুলে ভীরু ভীরু পায়ে আর কাঁপা কাঁপা ভঙ্গিতে স্ত্রীর পাশটিতে এসে বসলেন। তার একটা হাত তুলে নিলেন নিজের হাতের মধ্যে।

'এ কী!' চমকে উঠে ফিসফিসিয়ে বললেন মিসেস হ্যামারস্টেইন, 'তুমি এত কাঁপছ কেন?'

'কে বলতে পারে' শুকনো গলায় বললেন হ্যামারস্টেইন, 'আজকের রাতটাই আমার সাহিত্যজীবনের শেষ রাত কি না।'

'দেখো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।' সান্ত্বনা দিলেন মিসেস।

কথার উত্তর দিলেন না হ্যামারস্টেইন। বুকের মধ্যে এখনো হাতুড়ির ঘা পড়ছে। কী জানি, কী হয়। উত্থান না পতন? নবজন্ম না অকালমৃত্যু? সিদ্ধি না অসাফল্য।

প্রেক্ষাগৃহের আলো নিবতেই রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোগুলো এবার জ্বলে উঠছে একটি একটি করে।

ব্রাউন রঙের যবনিকা তখনো নিশ্চল।

এবার সেটা নড়ে উঠলো। আর বুক ঢিপঢিপ কয়েকটি মুহূর্ত।

শুরু হল নাটক—'ওক্‌লাহামা'।

হ্যামারস্টেইনের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দ এবার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

'এতো নার্ভাস হবার কী আছে?'

'হবো না? কী হবে কে জানে। ফুলের মালা, না ঠাণ্ডা জল। গরম অভিনন্দন, না বন্ধ দরজা? কি আছে ভাগ্যে কে জানে?'

নাটক শুরু হয়ে গেছে। গীতিনাট্য—ওক্‌লাহামা।

দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ। দৃষ্টি তাদের রঙ্গমঞ্চের প্রতি নিবদ্ধ। একটু একটু করে নাটকটি বেশ জমে উঠছে। নাটকের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা হাসছে, স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার করতালি দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

একসময় গান শুরু হল।

আঃ, কী সুন্দর সকাল, কী সুন্দর দিন।
আহা আমার মনও আজ হল রঙিন॥

ঘাড় ফেরালেন হ্যামারস্টেইন। না রঙ্গমঞ্চের দিকে নয়, দর্শকদের দিকে। কারোর মাথা দুলছে গানের ছন্দে ছন্দে, আবার কারোর মুখও নড়ছে। হ্যামারস্টেইন স্পষ্ট শুনতে পেলেন তাঁর পাশের একটি মেয়ে গুনগুনিয়ে গাইছে।

আঃ, কী সুন্দর সকাল, কী সুন্দর দিন।
আহা, আমার মনও আজ হল রঙিন॥

'এতো নার্ভাস হবার কী আছে ?' [পৃষ্ঠা ২৭৪

আর হ্যামারস্টেইনের বুকের মধ্যে এবার হাতুড়ির শব্দটা রীতিমত জোরে জোরে শোনা যাচ্ছে। এবার ভয়ে নয়, আনন্দে তিনি বুঝি হার্টফেইল করবেন।

যে মানুষ বড় হয় তাকে অনেক আঘাত সহ্য করতে হয়। উন্নতির পথ তো সমতল নয়, রীতিমত বন্ধুর। হোঁচট খেতেই হবে। তাই বলে হার মানলে চলবে না, হাল ছাড়লে হবে না।

এগিয়ে যেতেই হবে। কুঁজো হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নয়, মাথা উঁচিয়ে বীরদর্পে। যদি বল এত শক্তি যোগাবে কে ? কেন ? নিষ্ঠা এবং সততা থাকলে মনোবল আপনি গড়ে ওঠে।

তোমরা যখন বড় হয়ে দেশের ও দশের একজন হবে তখন এর সত্যতা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে।

হ্যামারস্টেইন তাঁর গানের মধ্যে বলেছেন—অন্ধকারকে কখনো ভয় কোরো না। আর ঝড়ের মধ্যে সবসময় মাথা উঁচু রেখে চলবে। মানে কাপুরুষের মত ভয়ে ভয়ে নয়, মানুষের মত অশঙ্কে আর অসংকোচে বাঁচতে হবে। বাধা বিপত্তি যাই আসুক, ভয়ে পিছিয়ে পড়া চলবে না।

হ্যামারস্টেইন যখন সম্মানের উচ্চ শিখরে তখন হলিউড থেকে ফিল্মে তাঁর ডাক এলো। একটা মোটা টাকার চুক্তি করে যোগ দিলেন কালিফোর্নিয়ায়।

কিন্তু পরপর প্রথম দুটি ছবি একেবারে ফ্লপ্ করলো।

কর্তৃপক্ষ তাঁকে একলক্ষ ডলার গুণগার দিয়ে চুক্তিপত্র ফিরিয়ে নিলেন।

হ্যামারস্টেইন হেসে বললেন, 'কিছু না-লেখার জন্য এত বেশি টাকা পৃথিবীতে বোধহয় আর কোন লেখক পান নি।'

তিনি সবসুদ্ধ ছেচল্লিশটি গীতিনাট্য রচনা করেছেন। তার মধ্যে দুটি ছবি আমাদের ভারতবর্ষে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। তার একটি হল 'সাউথ প্যাসিফিক' আর অপরটি 'সাউণ্ড অব মিউজিক'। যার প্রত্যেকটি গান আজ তোমাদের মুখে মুখে, তাই না ?

ভাবো তো, তিনি যদি প্রথম জীবনেই নিরাশ হয়ে পড়তেন তাহলে সাউণ্ড অব মিউজিকের মত গীতিনাট্যের সৃষ্টি হত কি ?

তাছাড়া যেসব গীতিনাট্য আজ অবহেলিত, ভবিষ্যতের মানুষ একদিন তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবে। যিনি শিল্পীসুন্দর, তাঁর সৃষ্টি কখনো ব্যর্থ হয় না। ভাবীকালের হাতে থাকে তার বিচার।

কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৩শে অক্টোবর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে অস্কার হ্যামারস্টেইন মারা গেছেন। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রডওয়ে আর লণ্ডনের থিয়েটারগুলিতে তাঁর সম্মানে তিন মিনিটের জন্য সব আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর গানের মধ্যে শিল্পীদের কণ্ঠে তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন।

সত্যি কিনা তোমরাই বলো।

রাজনীতির চেয়ে সুখে থাকা ভাল

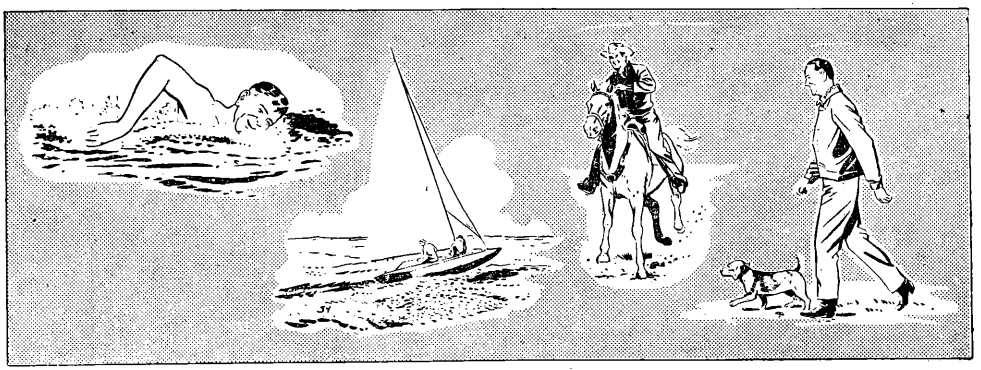

ওদেশের ছেলেরা অবসর পেলেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটে। কিংবা দুজনে একটা পালতোলা নৌকা নিয়ে সাগরে ভেসে পড়ে। কেউ ঘোড়ায় চড়ে ক্ষেত খামারে ছুটে বেড়ায় আর, বুড়ো হলে পথে হেঁটে শরীরটাকে তাজা রাখে। এইভাবে তারা সুখে থাকে। এদেশে শুধু রাজনীতি করে।

অনিল ভৌমিক

২

ভোর হয় হয়। পুবদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় আকাশটায় লালচে রঙ ধরেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই। সাদা সাদা সমুদ্রের পাখীগুলো উড়ছে আকাশে।

বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির মধ্যে সমুদ্রের জলের ধার ঘেঁষে ফ্র্যান্সিস পড়ে আছে। মড়ার মত। কোন সাড় নেই। ঢেউগুলো বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ওর গা পর্যন্ত চলে আসছে।

সমুদ্র-পাখীর ডাক ফ্র্যান্সিসের কানে গেল। অনেক দূরে যেন পাখীগুলো ডাকছে। আস্তে আস্তে পাখীর ডাক স্পষ্ট হল। চেতনা ফিরে পেল ফ্র্যান্সিস। বেশ কষ্ট করেই চোখ খুলতে হল ওকে। চোখের পাতায় নুনের সাদাটে আস্তরণ পড়ে গেছে। মাথার ওপরে আকাশটা দেখল ও। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে আড়ষ্ট ঘাড়টা ফেরাল। দেখল সূর্য উঠছে। মস্তবড় আলোর মত টকটকে লাল সূর্য। আস্তে আস্তে সূর্যটা ঢেউয়ের গা লাগিয়ে উঠতে লাগল। সবটা উঠল না। বড় বিন্দুর মত একটা অংশ লেগে রইল জলের সঙ্গে। তারপর টুপ করে উঠে ওপরের লাল থালাটার সঙ্গে মিশে গেল। সমুদ্রে এই সূর্য ওঠার দৃশ্য ফ্র্যান্সিসের কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু আজকে এটা নতুন বলে মনে হল। বড় ভাল লাগল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসছে ও। বেঁচে আছে। ফ্র্যান্সিস জোরে শ্বাস ফেলল—আঃ কী সুন্দর এই পৃথিবী।

বেশ কষ্ট করে শরীরটা টেনে তুলল ফ্র্যান্সিস। হাতে ভর রেখে একবার

চারদিকে তাকাল। ভরসা—যদি জাহাজের আর কেউ ওর মত ভাসতে ভাসতে এখানে এসে উঠে থাকে। কিন্তু বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে যতদূর চোখ যায় ও কেউকেই দেখতে পেল না। ওদের জাহাজের কেউ বোধহয় বাঁচেনি! জ্যাকবের কথা মনে পড়ল। মনটা ওর বড় খারাপ হয়ে গেল।

গা থেকে বালি ঝেড়ে ফেলে ফ্র্যান্সিস উঠে দাঁড়াল। হাঁটুদুটো কাঁপছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। শরীর অসম্ভব দুর্বল লাগছে। তবু উপায় নেই। চলতে হবে। লোকালয় খুঁজে বের করতে হবে। খাদ্য চাই, আশ্রয় চাই, কিন্তু কোন্‌দিকে মানুষের বসতি?

সূর্যের আলো প্রখর হতে শুরু করেছে। ফ্র্যান্সিস হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে চারদিক দেখতে লাগল, একদিকে শান্ত সমুদ্র। অন্যদিকে শুধু বালি আর বালি। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। এ কোথায় এলাম? আর ভেবে কী হবে! ফ্র্যান্সিস পা টেনে টেনে সেই ধুধু বালির মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল।

মাথার ওপর সূর্য উঠে এল। কী প্রচণ্ড তেজ সূর্যের আলোর। তৃষ্ণায় জিভ পর্যন্ত শুকিয়ে আসছে, হু হু হাওয়া বইছে। বালি উড়ছে। শরীর আর চলে না। মাথা ঘুরছে। চোখের সামনে আগুন-ঝরানো সূর্য, বালির দিগন্ত দুলে দুলে উঠছে। শরীর টলছে। তবু হাঁটতেই হবে। একবার থেমে পড়লে, বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। জোরে শ্বাস নিল ফ্র্যান্সিস। অসম্ভব! থামা চলবে না।

এ কি? মরীচিকা নয় তো? ফ্র্যান্সিস হাত দিয়ে চোখদুটো ঘষে নিল। নাঃ। ঐ তো সবুজের ইশারা। কয়েকটা খেজুর গাছ। হাওয়ায় পাতাগুলো নড়ছে।

কাছে আসতেই নজরে পড়ল তাঁবুর সারি, খেজুর গাছে বাঁধা অনেকগুলো ঘোড়া, একটা ছোট্ট জলাশয়। একটা লোক ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াবার তদারকি করছিল। সেই প্রথম ফ্র্যান্সিসকে দেখতে পেল। লোকটা প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তারপর তীক্ষ্ণস্বরে কী একটা কথা বলে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুগুলো থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এল। তাদের গায়ে আরবীদের পোশাক। ঢোলা জোব্বা পরনে। মাথায় বিড়েবাঁধা সাদা কাপড়—কান পর্যন্ত ঢাকা। ফ্র্যান্সিসের বুকে আর দম নেই। মুখ দিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে তখন। ফ্র্যান্সিস শুধু দেখতে পেল লোকগুলোর মধ্যে কারো কারো হাতে খোলা তরোয়াল রোদ্দুরে ঝিকিয়ে উঠছে। আর কিছু দেখতে পেল না ফ্রান্সিস। সব কেমন আবছা হয়ে আসছে। ফ্র্যান্সিস মুখ থুবড়ে পড়ল বালির ওপর। অনেক লোকের কণ্ঠস্বর কানে এল। ওরা নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করতে করতে এদিকেই আসছে। তারপর আর কোন শব্দই ফ্র্যান্সিসের কানে গেল না। সব অন্ধকার হয়ে গেল।

ফ্র্যান্সিস যখন চোখ মেলল তখন রাত হয়েছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে বুঝল এটা তাঁবু। আস্তে আস্তে ওর সব কথা মনে পড়ল। চারদিকে তাকাল। এককোণে মৃদু আলো জ্বলছে। একটা বিছানার মত নরম কিছুর ওপর ও শুয়ে আছে। শরীরটা এখন অনেক ভাল লাগছে। ওপাশে কে যেন মৃদুস্বরে কথা বলছে। ফ্র্যান্সিস পাশ ফিরল। লোকটা তাড়াতাড়ি এসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। লোকটার মুখে দাড়ি গোঁফ। কপালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। হয় তো তরোয়ালের কোপের। লোকটা হাসল—'কী? এখন ভাল লাগছে?'

মৃদু হেসে ফ্র্যান্সিস মাথা নাড়ল।

—খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ।

কাছে আসতেই নজরে পড়ল তাঁবুর সারি।
[পৃষ্ঠা ২৭৮

লোকটা দ্রুতপায়ে তাঁবুর বাইরে চলে গেল। ফ্র্যান্সিস বুঝল—এই লোকটাই তার সেবাশুশ্রূষার ভার নিয়েছে।

পরের দিন বিকেল পর্যন্ত ফ্র্যান্সিস প্রায় সমস্তক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল। কপাল কাটা লোকটাই তার দেখাশুনো করল। ফ্র্যান্সিস ঐ লোকটার কাছ থেকে শুধু এইটুকুই জানতে পারল যে এরা একদল বেদুইন ব্যবসায়ী। এখান থেকে কিছুদূরেই আমদাদ শহর। এখানকার সুলতানের রাজধানী। ওখানেই যাবে এরা। সারাদিনে এদের দলপতি বারদুয়েক ফ্র্যান্সিসকে দেখে গেছে। দলপতির দীর্ঘ দেহ, পরনে আরবীয় পোশাক, কোমরে সোনার কাজকরা খাপে লম্বা তরোয়াল। দলপতি বেশ হেসেই কথা বলেছিল ফ্র্যান্সিসের সঙ্গে। ফ্র্যান্সিসকে তার যে বেশ পছন্দ হয়েছে এটা বোঝা গেল। দলপতির সঙ্গে সবসময়ই একটা লোককে দেখেছিল ফ্র্যান্সিস। মুখে বসন্তের দাগ। কেমন এবড়ো-খেবড়ো কঠিন মুখ। ধূর্ত চোখের দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় লোকটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

তখন সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। ফ্র্যান্সিস তাঁবু থেকে বেরিয়ে একটা খেজুর গাছের নীচে এসে বসল। জলাশয়ের ওপারে একজন বেদুইন

একটা তেড়াবাঁকা তারের যন্ত্র বাজিয়ে নাকিসুরে গান করছে। ফ্র্যান্সিস চুপ করে বসে গান শুনতে লাগল। হঠাৎ ফ্র্যান্সিস দেখল দূরে ছায়া-ছায়া বালি-প্রান্তর দিয়ে কে যেন খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। লোকটা এল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমেই সোজা দলপতির তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই দলপতির তাঁবু থেকে কয়েকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কয়েকজন ঢুকল। বেশ একটা ব্যস্ততার ভাব। কী খবর নিয়ে এল লোকটা? ফ্র্যান্সিসের হঠাৎ মনে হল ওর পাশেই কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। আরে? সেই কপাল-কাটা লোকটা। লোকটা তো ওর জন্যে অনেক করেছে অথচ লোকটার নামই জানা হয়নি।

—আরে বসো বসো। ফ্র্যান্সিস একটু সরে ওকে বসবার জায়গা করে দিল।

লোকটা বসল।

—কাণ্ড দেখ—তোমার নামটাই জানা হয় নি।

—ফজল আলি, সবাই ফজল বলেই ডাকে। লোকটা আস্তে আস্তে বলল।

এবার কী জিজ্ঞেস করবে ফ্র্যান্সিস ভেবে পেল না।

ফজলই কথা বলল—তুমি আমার কপালের দাগটার দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়েছিলে।

ফ্র্যান্সিস একটু অপ্রস্তুত হল। বলল—তা ওরকম দাগ তো বড় একটা দেখা যায় না।

—আমার ভাই তরোয়াল চালিয়েছিল, এটা তারই দাগ।

—সে কি!

—হ্যাঁ। আমি অবশ্য ভাইটাকে দু'টুকরো করে ফেলেছিলাম।

ফ্র্যান্সিস চুপ করে রইল।

—সেইদিন থেকে তরোয়াল একটা রাখতে হয় তাই রাখি, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা খাপ থেকে বের করিনি। যাক্‌গে—ফজল একটু থেমে বলল—তুমি তো ভাই এখানকার লোক নও।

—ঠিকই ধরেছো—আমি ভাইকিং।

—ভাইকিং! বাপসরে, তোমাদের বীরত্বের অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি।

—তাই নাকি? ফ্র্যান্সিস হাসল।

—তোমার নাম?

—ফ্র্যান্সিস।

—কোথায় যাচ্ছিলে?

ফ্র্যান্সিস একটু ভাবল। সোনার ঘণ্টার খোঁজে যাচ্ছিলাম এ সব বলা বিপজ্জনক। তা ছাড়া ও সব বললে ওকে পাগলও ঠাউড়ে নিতে পারে। বলল—এই মানে—ব্যবসার ফিকিরে—

—জাহাজডুবি হয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

দু'জনের কেউ আর কোন কথা বলল না। ফ্র্যান্সিস একবার আকাশের দিকে তাকাল। পরিষ্কার আকাশ। সমস্ত আকাশ জুড়ে তারার ভিড়। কী সুন্দর লাগছে দেখতে। হঠাৎ ফজল চাপাস্বরে ডাকল—ফ্র্যান্সিস ?

—কী ?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দল ছেড়ে পালাও।

ফ্র্যান্সিস চমকে উঠল।

—কেন ?

ফজল চারদিক তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল—এটা হচ্ছে বেদুইন মরুদস্যুদের দল।

—সে কি !

—হ্যাঁ।

—তুমিও তো এই দলেরই।

—উপায় নেই ভাই—একবার এই দস্যুদলে ঢুকলে পালিয়ে যাওয়ার সব পথ বন্ধ।

—কেন ?

—এই তল্লাটের সব শহরে বাজারে মরুদ্যানে এদের চর রয়েছে। তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবে। তারপর—

—মানে—খুন করবে ?

—বুঝতেই পারছো।

—কিন্তু—ফ্র্যান্সিসের সংশয় যেতে চায় না। বলল—সর্দারকে তো বেশ ভালো লোক বলেই মনে হল।

—তা ঠিক। কিন্তু সর্দারকে চালায় ঐ কাশেম—কাশেমকে দেখেছো তো।

—হ্যাঁ—বীভৎস দেখতে।

—যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। ওর মত সাংঘাতিক মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

—হুঁ। কাশেমকে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে।

—কালকেই দেখতে পাবে কাশেমের নিষ্ঠুরতার নমুনা।

—তার মানে ?

—আজকে শেষ রাত্তিরে আমরা বেরুবো। গুপ্তচর খবর নিয়ে এসেছে এইমাত্র—মস্তবড় একটা ক্যারাভ্যান (মরুপথের যাত্রীদল) এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূর দিয়ে যাবে।

—ক্যারাভ্যান ?

—হ্যাঁ। ব্যবসায়ীদের ক্যারাভ্যান। প্রায় লাখ-খানেক টাকার মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে।

তা ছাড়া কাঁচা টাকা, সোনার গয়নাগাঁটি এসব তো রয়েইছে। ক্যারাভ্যানে তো শুধু ব্যবসায়ীরাই যায় না—অন্য লোকেরাও যায় তাদের পরিবারের লোকজন নিয়ে। দল বেঁধে গেলে ভয় কম।

—তোমরা ক্যারাভ্যান লুঠ করবে ?

—সর্দারের হুকুম। কথাটা বলেই ফজল গলা চড়িয়ে অন্য কথা বলতে শুরু করল—'শুনেছি তোমাদের দেশে নাকি বরফ পড়ে—আমরা কিন্তু বরফ কোনদিন চোখেও দেখিনি।' ফ্র্যান্সিস কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। তবে অনুমান করল ফজল কাউকে দেখেই অন্যকথা বলতে শুরু করেছে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল খেজুর গাছের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এল। কাশেম! কাশেম গম্ভীরগলায় বলল—ফজল—শেষ রাত্তিরে বেরুতে হবে—ঘুমিয়ে নাও গে যাও।

—হ্যাঁ এই যাচ্ছি। ফজল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। চলে যেতে যেতে গলা চড়িয়ে বলল—তাহলে ঐ কথাই রইল—তুমি ওখান থেকে বরফ চালান দেবে বদলে আমি এখান থেকে বালি চালান দেব।

কাশেম এবার কুৎসিত মুখে হাসল—এই সাদা ভিনদেশী—তুইও যাবি আমাদের সঙ্গে।

ফ্র্যান্সিসের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। কথা বলার কী ভঙ্গী! কিন্তু ও চুপ করে রইল। এখনও শরীর দুর্বল। এখন আশ্রয়ের খুবই প্রয়োজন। চটাচটি করলে নিজেরই ক্ষতি। সময় আসুক। এই অপমানের শোধ তুলবে।

ফ্র্যান্সিস কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। পেছনে শুনল কাশেমের বীভৎস হাসি—'ওঃ শাহ্‌জাদার গোঁসা হয়েছে—হা—হা।'

মরুদস্যুর দল ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। শেষ রাত্রির আকাশটা কেমন ঘোলাটে। তারাগুলো অস্পষ্ট। একটা ঠাণ্ডা শিরশির হাওয়া বইছে। ফ্র্যান্সিস উটের লোমের কম্বলটা কান অব্দি তুলে দিল। কোমরে হাত দিল একবার। নতুন বেল্ট নতুন তরোয়াল। খাপটায় হাত দিল। এইসব সর্দার দিয়েছে।

বালিতে ঘোড়ার ক্ষুরের অস্পষ্ট শব্দ। ঘোড়ার শ্বাস ফেলার শব্দ। মাঝে মাঝে ঘোড়ার ডাক। মরুদস্যুর দল ছুটে চলেছে। কাশেমের চিৎকার শোনা গেল—আরো জোরে। ফ্রান্সিস ঘোড়ার রাশ অনেকটা আলগা করে দিল। ঘোড়ার পেটে পা ঠুকল। সকলেই ঘোড়ার চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

পুবের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই লাল টকটকে সূর্য উঠল। তারপর নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ল ধুধু বালির প্রান্তরে। সেই আলোয় হঠাৎ দূরে দেখা গেল—একটা আঁকাবাঁকা সচল রেখা। ক্যারাভ্যান চলেছে। কাশেমের উল্লসিত উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আরো জোরে।

বিদ্যুৎগতিতে ধুলোর ঝড় তুলে মরুদস্যুর দল ছুটল ক্যারাভ্যান লক্ষ্য করে।

একটু পরেই দেখা গেল ক্যারাভ্যানের আঁকাবাঁকা রেখাটা ভেঙে গেল। ওরা মরুদস্যুর দলকে দেখতে পেয়েছে। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। কিন্তু মালপত্র আর সওয়ারী পিঠে নিয়ে উটগুলো আর কত জোরে ছুটবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মরুদস্যুর দল ওদের দু'দিক থেকে ঘিরে ধরল। সকালের সুন্দর আকাশটা ভরে উঠল নারী আর শিশুদের ভয়ার্ত চিৎকারে।

শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ। ক্যারাভ্যানের ব্যবসায়ীরা কিছু ভাড়াকরা পাহারাদার নিয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই লড়াই শুরু হল প্রথমে। উটের পিঠে কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া ছইগুলো থেকে ভেসে আসতে লাগল ভয়ার্ত কান্না চিৎকার। কিন্তু সেদিকে কারো কান নেই। সকালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল তরোয়ালের ফলা। তারপর তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকি, ঝন ঝন শব্দ, মুমূর্ষুদের চিৎকার, গোঙানি।

ফ্র্যান্সিস একপাশে ঘোড়াটা দাঁড় করিয়ে এই যুদ্ধ দেখছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যারাভ্যানের প্রহরীরা প্রায় সবাই বালির উপর লুটিয়ে পড়ল।

এমন সময় ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে আরো কয়েকজন তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্র্যান্সিস অবাক্ হয়ে দেখল তার মধ্যে একটি কিশোর ছেলে। ছেলেটি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে তরোয়াল চালাতে লাগল। পাঁচ ছয়জন মরুদস্যু ওকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ছেলেটির ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারছে না কেউ। ছেলেটির তরোয়াল চালানোর নিপুণ ভঙ্গী আর দুর্জয় সাহস দেখে ফ্র্যান্সিস মনে মনে তার তারিফ না করে পারল না। যারা ওকে ঘিরে ধরেছিল তাদেরই দু'জন রক্তাক্ত শরীরে পালিয়ে এল। ছেলেটি কিন্তু তখনও অক্ষত। সবিক্রমে তরোয়াল চালাচ্ছে। কিশোর ছেলেটিকে দেখে ফ্র্যান্সিসের মনে পড়ল নিজের ছোট ভাইটির কথা। তার ভাইটিও এমনি তেজী, এমনি নির্ভীক।

এবার আট দশজন মরুদস্যু ছেলেটিকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ছেলেটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে ওদের বার বার হার স্বীকার করতে হল।

হঠাৎ দেখা গেল কাশেম ছেলেটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্র্যান্সিস বুঝল কাশেমের নিশ্চয়ই কোন কুমতলব আছে। লড়াই তখন শেষ। ক্যারাভ্যানের দলের মাত্র কয়েকজন তখনও কোনরকমে টিকে আছে। বাকী সবাই মৃত নয় তো মারাত্মকভাবে আহত। কাজেই লুঠতরাজ চালাতে এখন আর কোন বাধাই নেই। কিন্তু কাশেমের মতলব বোধহয় অন্য কিছু। ও বোধহয় কাউকেই বেঁচে থাকতে দেবে না। ফ্র্যান্সিস ঘোড়াটা চালিয়ে নিয়ে একটু এগিয়ে দাঁড়াল।　　(ক্রমশঃ)

হাঁদা-ভোঁদার

বুদ্ধি খাটানো

এবারে আমার কিক্ দ্যাখ !
এঃ, একটুর জন্যে এদিক ওদিক ছুয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো !
আবার দ্যাখ, কেমন এখানে দাঁড়িয়েই ভেতর থেকে বল বের করে আনি !
আবার সামান্য টানেই ঘর থেকে বল হাতে চলে আসবে— এ কি, কিছুতে আটকেছে, জোরে হ্যাঁচকা দি !
অ্যা-অ্যাই মরেচে !
তোর বিশেষ তীর এবারে একটা হাতপা ওয়ালা বল আনছে হাঁদা !
হতচ্ছাড়া প্যাকাটি! একটু সুযোগ পেলেই তোর তীর ছুঁড়ে তোকে ধরবো, তারপর—

সব্যসাচী

২

ব্ব্যাং—

টারজন ডুব দিল সঙ্গে সঙ্গে। শিফটাদের রাইফেলের আওয়াজ ঐ ব্ব্যাং।

সাঁতার দিচ্ছে ঘোড়া। টারজান তার লাগাম ধরে ভেসে যাচ্ছে তার পাশে পাশে। ডুব সাঁতার কেটে কেটে। এতক্ষণ ডুব দেয়নি, কারণ জলের তলায় সেঁধিয়ে কুমিরের কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

এতক্ষণ ডুব দেয় নি, এবার কিন্তু দিতে হল। কারণ কুমিরের চেয়েও সাংঘাতিক জিনিস হল বুলেট। কুমিরকে এড়ানো যায়। দরকার হলে তার সঙ্গে লড়াও যায়, কিন্তু বুলেট গায়ে বিঁধলে আর করার নেই কিছু।

ভেসে যাচ্ছে জলের তলা দিয়ে, প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা যে এই বুঝি ধরল কুমিরে। কিন্তু কই? কামড় তো বসে না কোন অঙ্গে! হল কী জন্তুটার? ভুচ করে একবার জল থেকে মাথা তুলল টারজান, পলকের তরে তাকাল পিছনের দিকে।

পলকের তরে তাকিয়ে, সেদিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারল না ও। কুমির যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। উলটিপালটি খাচ্ছে নদীর বুকে, আর নদীর জল লালে-লাল হয়ে যাচ্ছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। শিফটার বুলেট কুমিরের গায়ে বিঁধেছে। বেশ মোক্ষমভাবেই বিঁধেছে নিশ্চয়। তা না হলে জলদানব এমন অসহায়ের মত আছাড়ি-বিছাড়ি খেতো না মরণযন্ত্রণায়।

যা শত্রু পরে পরে। এখন নির্ভয়ে ডুব-সাঁতার কাটা যেতে পারে কিছুক্ষণ। যতক্ষণ

না বুলেটের পাল্লা পেরিয়ে যাওয়া যায় শিফটারাও ঘোড়া নিয়ে বা না নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। অমন বোকামি তারা করবে না। একে তো নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে গুলি চালানো যায় না; তায় আবার নদীর জলে আরও কুমির থাকারও আটক নেই কিছু।

একটু পরেই টারজান মাথা তুলল, ঘোড়ার পিঠেই উঠে বসল আবার আরাম করে। শত্রু অনেক পিছনে পড়ে আছে, ঐ যে মনের দুঃখে ফিরেও যাচ্ছে তারা কোহেটুং উপত্যকার দিকে। ঐ দিকেই অবশ্য ডেরা ওদের। ডেরায় ফেরার পথে মৃত সাথীদের কবর কি দেবে ওরা। করবে অত মেহনত? অন্ততঃ টেনে ফেলে দেবে হাওড়ের জলে? কিছুই না করে যদি, অবাক্ হওয়ার কিছু নেই। পলাতক ঘোড়া দু'টোকে পাকড়াবার দিকেই তাদের সব শক্তি আর উৎসাহ তারা প্রয়োগে করবে নিশ্চয়।

পায়ের নীচ দিয়ে ঘোড়াটা সটকে বেরিয়ে গেল। [পৃষ্ঠা ২৮৮

মরুক ওরা। চুলোয় যাক আপাততঃ। ওদের সঙ্গে পরে বোঝাপড়া হবে টারজানের। অহেতুক অনেক তকলিফ ওরা দিয়েছে। শিকারে বাগড়া দিয়েছে, পহেলা দফায়। যার ফলে ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে বনের রাজার। তার পর—

মরুক গিয়ে। পরপারে পৌঁছে গিয়েছে ঘোড়া, উঠে এসেছে কূলে। এক্ষুণি ওকে খালাস দেওয়ার মতবল নয় টারজানের। সমুখেই বিশাল বনানী দেখা যায়। ওটা কী-ধরনের জায়গা, কিছু ভোজনযোগ্য শিকার ওখানে মিলতে পারে কিনা, সেটা না দেখে বাহনকে বিদায় দিতে ইচ্ছুক নয় ও। পায়ে হাঁটতে ও ভালই বাসে। কিন্তু এখন তার তাড়াতাড়ি আছে। ঐ ক্ষিধে—

বনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিল টারজান।

মনটা খুশীতে ভরে উঠল অল্প দূর যেতেই। আছে, হরিণ আছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দে চমকে উঠে ঐ যে দুদ্দাড় পালায় এদিকে ওদিকে। টারজান আর দেরি করবে না।

ডাইনে গাছ, বাঁয়ে গাছ, ঘোড়া চলেছে মাঝখান নিয়ে। একখানা হাত উঁচিয়েই রেখেছে ও। জুতসই একখানা মোটা ডাল মাথার উপরে দেখেই সে দিল লাফ উপরপানে। ধরে ফেলল ডাল, পায়ের নীচে দিয়ে ঘোড়াটা সটকে বেরিয়ে গেল, পিঠের সওয়ারকে বৃক্ষশাখায় দোদুল অবস্থায় রেখে। যাক, সুখে স্বচ্ছন্দে বনে বনে চরে বেড়াক, অনেক কাজ ও দিয়েছে টারজানকে, আর ওকে কোন প্রয়োজন নেই আপাততঃ।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা হরিণ মেরে নিয়ে আবার টারজান উঠে বসল এক বৃহৎ বনস্পতির তেডালায়। কটি থেকে ছোরা নিয়ে ফালি ফালি মাংস কেটে নিচ্ছে সদ্যোনিহত শিকারের ধড় থেকে, আর চামড়াটা ছোরার সাহায্যেই চেঁচে ফেলে দিয়ে রক্তমাখা মাংসগুলো কাঁচাই কচমচিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে পরম পরিতোষের সঙ্গে। তার এই মুহূর্তের চেহারা দেখে কে বিশ্বাস করবে যে এই লোকই মহামূল্য শৌখিন পোশাকে অঙ্গ আবৃত করে ইংলণ্ডের বাকিংহাম প্রাসাদে রাজকীয় ভোজের টেবিলে সেদিনও পানাহার করে এসেছে খোদ রাজার পাশে বসে ?

উত্তরাধিকার সূত্রে টারজান হচ্ছে ইংলণ্ডের অন্যতম বংশানুক্রমিক 'পীয়ার', লর্ড উপাধিধারী অভিজাত পুরুষ লর্ড গ্রেস্টোক। এদিকে আফ্রিকার জঙ্গলে সে আশৈশব মানুষ, বৃক্ষচূড়াবিহারী মহাকপিদের সমাজে। কদাচিৎ কখনো ইংলণ্ডে গিয়ে সভ্য-জীবনের অরুচিকর পরিবেশে দুই এক বৎসর কাটাতে বাধ্য হলেও প্রথম সুযোগেই সে ফিরে আসে তার চিরাভ্যস্ত অরণ্য জীবনে।

খাওয়া শেষ হল, ভুক্তাবশেষ মাংস আর হাড়গুলো বনতলে ছড়িয়ে দিল টারজান, চিতা বা হায়না শেয়ালের ভোগে লাগবে ওসব। তেডালাটা বৃক্ষপত্রের ঝাড়ু দিয়ে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে ওখানেই দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে ফেলল কয়েক মিনিটের মধ্যে। বর্ষার দিনে বর্ষা যখন বন্ধ হয়, গুমোট গরমে প্রাণটা আই-ঢাই করে এ-মুলুকে। বনছায়া তখন আরাম দেয় অপেক্ষাকৃত।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দিন কাটাবার পাত্র তা বলে টারজান নয়। বিশ্রাম শুধু দেহকেই দেওয়া। মন তার নিজের কাজ করে চলেছে পরিপূর্ণ উৎসাহে। সারা সকাল বেলার অভিজ্ঞতাগুলোকে নাড়াচাড়া করে নিজের পরবর্তী করণীয় স্থির করে নিচ্ছে।

করণীয় ? প্রথম করণীয় হল সাজা দেওয়া।

বনের রাজার উপর অহেতুক আক্রমণ চালিয়েছে। কতকগুলো দুর্বৃত্ত শিফ্‌টা, ধৃষ্টতার সীমা নেই ওদের। টারজান নির্বিরোধী মানুষ, উদরে ক্ষুধার আগুন না জ্বলছে যতক্ষণ, কোন জীবের হিংসা করে না। উলটো বরং সাধ্যমত উপকারই করে সকলের মানুষ এবং পশু, উভয় জাতিরই। বিনিময়ে সে শুধু প্রত্যাশা করে যে মানুষেরা এবং

পশুরা তাকে নিরুদ্বেগে বিচরণ করতে দেবে বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে। ঐতেই তার বিলাস, ওকেই সে বিবেচনা করে স্বর্গসুখ বলে।

আজ সকালে ঐ শিফটাগুলি অকারণে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল টারজানের। সে যখন খাদ্যের সংস্থান করবার জন্য শিকারে নেমেছে, ব্যাঘাত ঘটিয়েছে তাতে, এবং তার উপরেও যা বড় কথা, আক্রমণ করেছে রাইফেল চালিয়ে। টারজান যদি টারজান না হয়ে অন্য কেউ হতো, তাকে এই নদীপারের তেডালায় বসে আরাম করতে হতো না এতক্ষণ। ওদিকের সেই হাওড়ের ধারে ঘাসের বনে পড়ে থাকত তার মৃতদেহ, তার মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য এতক্ষণ তুমুল রেষারেষি লেগে যেত ডাঙ্গার শেয়াল আর আকাশের শকুনির মধ্যে।

অত্যাচার হয়েছে টারজানের উপরে, এতে সন্দেহ নাস্তি। আর নীরবে অত্যাচার সহ্য করবার লোক মহাকপিদের পোষ্যপুত্র এই টারজান কদাপি নয়। অতএব—

উঠে বসল টারজান। গাছ থেকে লাফিয়ে নামল। বনভূমি পেরিয়ে নদীতে নামল। এবারে আর শত্রুর ঘোড়ার পিঠে চেপে আরামে নদীপার হওয়াটা ঘটছে না, তবে তার জন্য আফসোস তার নেই। পেশীচালানায় আনন্দ অনেক। প্রয়োজনে ঘোড়া কেন, সিংহের পিঠেও সওয়ার হওয়া চলে, হয়েছেও টারজান অনেক সময়। কিন্তু সে-প্রয়োজন যেখানে গরহাজির, সেখানে হাঁটা, বা লাফানো, বা সাঁতার দেওয়া নিশ্বাস নেওয়ার মতই স্বচ্ছন্দ কর্ম টারজানের কাছে।

এবারে আর কুমীর নেই, নদী নিঝঞ্ঝাটেই পেরুল টারজান। কূলে দাঁড়িয়ে একবার গা-মাথা ঝাড়া দিল যখন, উৎক্ষিপ্ত জলকণাগুলি অপরাহ্ণে রৌদ্রে ঝলক দিয়ে উঠল রামধনুর সাতরঙ্গা বাহার নিয়ে।

দ্রুত চলেছে টারজান। তৃণভূমির ধারে ধারে কালো-জলের হাওড়, একটা, দুটো, তিনটে শিফ্‌টার মৃতদেহ, সাথীরা তাদের না দিয়েছে কবর, না করেছে হাওড়ে নিক্ষেপ। শেয়াল-শকুনিরা সরে সরে বসল টারজানকে নিকটবর্তী দেখে। টারজান থমকে দাঁড়াল। অবস্থাটা রুচিতে বাধছে তার। পীড়া দিচ্ছে তার মনকে।

মানুষ! ইতর-জীব নয়, মানুষ ঐ তিনটি গতাসু শিফটা। গতাসু টারজানেরই নিক্ষিপ্ত শাণিত শরে। কলহটা টারজানের সৃষ্ট নয়। কিন্তু সে-তর্ক অবান্তর। টারজানের হাতেই মারা পড়েছে ওরা। তার সামান্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে ওদের হাড়গুলোর একটা গতি টারজানের নিতান্তই করা উচিত। হাড়গুলোই এখন অবশিষ্ট আছে শুধু, যে-মাংস দিয়ে ঢাকা ছিল হাড়গুলি, তা এখন ঐ শেয়াল-শকুনদের উদরে।

একটি একটি করে কঙ্কালগুলি তুলে নিয়ে হাওড়ের জলে শুইয়ে দিল টারজান,

তারপরে নিজে স্নান করল দূরের এক আঘাটায় নেমে, আবার ঝাড়া দিল গা এবং মাথা। এবার আর শীকরকণায় রামধনুর ঝলক জ্বলে উঠল না, কারণ রৌদ্র এখন পড়ে এসেছে, সূর্য প্রায় চক্রবালে বিলীন হওয়ার যোগাড়।

দ্রুত পা চালাতে হবে এবার। শিফটাদের সাজা দিতে হলে তাদের গিয়ে ধরতে হবে তাদের ডেরায়। না জানি কত দূরে সে-ডেরা। কতদূর, তাও জানে না টারজান, কোন্ পথ, তাও চেনে না। কিন্তু এ-দুটো সমস্যা কোন সমস্যাই নয় বনের রাজার কাছে।

সমস্যা নয়। কারণ অচেনা পথকে চিনে বার করা একান্ত সোজা কাজ ওর পক্ষে। বিশেষ করে কোন পুরোবর্তী পথচরের অনুসরণ করবার সময়। মাটিতে না থাকুক পায়ের দাগ, না ভেঙ্গে থাকুক তারা একটাও গাছের ডাল, গায়ের গন্ধ তো এখনও বাতাসে ভাসছে তাদের! মিশে আছে পথের ধুলোয়! আর গন্ধ শুঁকে মানুষ বা পশুর গতিপথ নির্ণয় করা বনচরদের সহজাত বিদ্যাই। টারজানও তো আশৈশব বনচরই।

আর দূরত্ব? যত দূরই হোক, টারজান সে-দূরত্ব অতিক্রম করবেই। একদিনে হোক, এক মাসে হোক। তবে সাধারণতঃ ডেরা ছেড়ে বেশী পথ যায় না শিফটাদের কোন টুকরো দল। আকস্মিক বিপদের ভয় তো সব সময়েই আছে! যেমন বিপদ ঘটে গিয়েছে আজ সকালেই ঐ হাওড়ের ধারে! ছয় জন বেরিয়েছিল, তিনজন এখন গভীর জলের তলায়; বাকী তিনজনও নিরাপদে ডেরায় ফিরতে পেরেছে কিনা, তা বনদেবতা বোঙ্গাই জানেন।

পথ চিনে নিতে কষ্ট নেই। যেখানেই একটু মাটি দমেছে পাথরের উপরে, সেখানেই ঘোড়ার পায়ের দাগ। পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকায় নামল যখন টারজান, সূর্য তখন অদৃশ্য। সমুখে গভীর বন। বড় বড় গাছের মাথায় এখনও অস্তরবির বিলীয়মান জৌলুশ হাওয়ায় দুলছে লাল সোনালী আস্তরণের মত। নীচের দিকে তাকালে কিন্তু সে-আলোর একটি কণিকাও চোখে পড়ে না কোথাও। যত নীচে তাকাবে, আঁধার ততই ঘনায়মান।

খানিকটা তৃণভূমি পেরিয়ে সেই অরণ্যেই ঢুকে পড়ল টারজান ভর সন্ধ্যেবেলা। মাটির দিকে তাকিয়ে কোন কিছু চোখে পড়ছে না এখন আর। আলো থাকলে দেখা যেত নরম মাটিতে সারি সারি ঘোড়ার পায়ের দাগ। কিন্তু দাগ দেখা না যাক, ঘোড়ার গায়ের গন্ধ ভকভক করছে বনের বদ্ধ বাতাসে। করতেই থাকবে, যতক্ষণ না এক পশলা বৃষ্টি হয়ে সে গন্ধ উবে যাচ্ছে।

তা বৃষ্টির খুব দেরি নেই। আকাশের পুব দিকটা কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে, টারজান বনছায়ায় প্রবেশ করার আগেই। এখন কড়াৎ-কড় একটা বাজের আওয়াজে কাজেকাজেই ওর বিস্ময়ের কিছু ছিল না। বিস্ময় নয়, তবে বিরক্তির কারণ আছে

ওতে। এইসময় বৃষ্টি নামে যদি, টার-জানের ঘোর অসুবিধাই হবে। মাটিতে পায়ের দাগ তো অদৃশ্যই, এবার বাতাসে গায়ের গন্ধও যদি না পাওয়া যায়, তবে পথের দিশা মিলবে কিসে ?

টারজান ছুটল অজানা গন্তব্যের দিকে। [পৃষ্ঠা ২৯২

দ্রুত পথ চলছে টারজান। যেখানে গাছ বেশ বড় বড়, সেখানে ডালে ডালে চলছে সে, হনূমানের মত লাফিয়ে লাফিয়ে। এ-রকম চলার সুবিধেও যত, আনন্দও তত। এমন দ্রুত-বেগে মাটির উপরে চলা অসম্ভব। আর মাটির উপরে চলার ঝক্কিই বা কত! পায়ে ফুটছে বাবলার কাঁটা, পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে যোজন জোড়া মহীরুহ, তার উপরে সাপ ছুটে আসছে উদ্যত ফণায়, সিংহ গজরাচ্ছে নেপথ্যের কোন ঝোপে ঝাড়ে, ঠিক মাথার উপরেই চিতা ওত পেতে আছে গাছের ডালে। নাঃ, মহাবিটপিদের তেতলা-চৌতলায় এক এক লাফে বিশ ফুট ত্রিশ ফুট পেরুতে পেরুতে পথপরিক্রমার মত আনন্দ, যে ইউরো-আমেরিকার আধুনিকতম কোন যানের মারফৎ পাওয়া যেতে পারে, একথা টারজান কখনই স্বীকার করবে না।

এ-অরণ্যে অবশ্য কোন গাছেই তেতলা-চৌতলায় এমন মজবুদ ডাল নেই, যার উপর দিয়ে একটা দৈত্যকার মানব বীরদাপে লাফিয়ে লাফিয়ে এগুতে পারে। কাজেই বায়ুপথের পর্যটন কমই ঘটছে টারজানের। হাঁটতে হচ্ছে মাটিতেই। সাপ-সিংহ-চিতার আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে। বৃষ্টি নামবার আগেই ডাকাতের আড্ডা খুঁজে বার করা চাই। বেশীদূর হবে না আর বোধহয়। কারণ জঙ্গল নিবিড় বটে, কিন্তু বহুবিস্তীর্ণ নয়। একেবারে ও-প্রান্তেও হয় যদি, দুই দণ্ডের ভিতর টারজান পৌঁছে যাবে। বনের মাঝামাঝি সে তো এসেই পড়েছে।

হঠাৎ একটা বিকট গর্জনে কেঁপে উঠল আকাশ পৃথিবী। না, মেঘের ডাক এটা নয়, মহারাজ ন্যুমার সিংহনাদ। পশুভাষায় সিংহের নাম ন্যুমা। টারজানও বনে বনে বিচরণ-কালে মনুষ্য-ভাষার চাইতে ঐ পশু-ভাষা নিয়ে কারবার করতে বাধ্য হয় বেশী। তাই

হুংকার শুনেই আপন মনে বলে উঠল— "এঃ, দস্যুদের আজ বরাত মন্দ দেখছি। তাদের খোঁজে বেরিয়েছে একদিকে টারজান। অন্যদিকে ন্যুমা।"

ন্যুমার গর্জন যদি থামল, শুরু হল মেঘের গর্জন। দুই চার ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল চড়বড় করে, মাথার উপর গাছের পাতায়। এ-অঞ্চলের বৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল এই যে তা রিমিঝিমি তালে সূক্ষ্মধারায় নামে না মাটিতে। যখনই নামে, বীরবিক্রমে তাথৈ নাচে তাণ্ডব তোলে প্রলয় রোলে।

তবে দুই চার ফোঁটা পড়ার পরেই ক্ষণিকের বিরাম দিলেন পজন্যদেব। এটা আসন্ন মহাবর্ষণের একটা উপক্রমণিকা মাত্র। টারজান এই বিরামের পূর্ণ সুযোগ নেবে, অন্ধকারকে উপেক্ষা আর বাধাবিঘ্নকে অগ্রাহ্য করে সে যথাসম্ভব দ্রুত ছুটল অজানা গন্তব্যের দিকে।

ছুটতে ছুটতেই হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠল টারজান। একটা আগুন দেখা যায়। নিশ্চয় দস্যুশিবিরের আগুন। আগুন অবশ্য বহু দূরবর্তীও হতে পারে। কিন্তু তাতে ক্ষতি হবে না। ওরই উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে টারজান অচিরেই ডাকাতের ডেরায় পৌঁছে যাবে।

তবে ভয় আছে বৃষ্টিতে আগুন নিবে যাওয়ার। তার আগেই পৌঁছানো দরকার ওখানে। ডাকাতেরা অবশ্যই প্রাণপণে চেষ্টা করবে ওটাকে জ্বালিয়ে রাখবার। নেবে যদি, সমূহ বিপদ ওদের। ন্যুমা তো একটু আগেই সাড়া দিয়েছে। ওকে দূরে ঠেকিয়ে রাখার একমাত্র হাতিয়ার যে ঐ আগুনই।

টারজান এগিয়ে চলেছে, আগুনের আভা ক্রমশঃ উজ্জ্বল থেকে আরও উজ্জ্বল, ওদিকে আকাশে মেঘের দাপাদাপি আর গর্জানি আরও উদ্দাম। এবার যখন বৃষ্টি নামবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এই অরণ্যভূমি।

সিংহটাই কি কম ক্ষেপেছে নাকি? গজন তার আরও ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে, আরও কাছাকাছি। ডাকাতের ডেরার গন্ধ আর আলো! ঠিক জেনেছে, ও-গন্ধ মানুষের গায়ের, আর সেসব মানুষ রয়েছে ঐ আগুনের আড়ালে। রাত্রির আহার পশুরাজ এইখান থেকেই সংগ্রহ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাদলার রাতে পশু শিকারের ঝামেলা আজ আর পোয়াবে না সে।

ঐ যে! দীর্ঘ সন্ধানের ফলে অবশেষে পাওয়া গিয়েছে ঈপ্সিত লক্ষ্যস্থল। ঐ সেই ডাকাতের ডেরা, যেখানকার ছয়টা ডাকাত আজ সকালে অহেতুক আক্রমণ চালিয়ে মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল টারজানের, রাইফেল চালিয়েছিল বনের রাজার মাথা তাক করে। সেই ছয়জনের ভিতর তিনজন যে ঐ আগুনের বলয়ের মাঝখানে বসে আরাম করে খানাপিনায় সময় কাটাচ্ছে, একথা চিন্তা করতেই টারজানের আপাদমস্তক জ্বালা করে উঠল ক্রোধে আর জিঘাংসায়।

অনেকখানি জায়গাকে গোলাকারে বেষ্টন করে দাউদাউ জ্বলছে ঐ আগুন। লেলিহান রক্তশিখা উঁচু হয়ে উঠেছে প্রায় মাথা সমান। কত শুকনো ডালপালা যে জ্বলছে ঐ অগ্নিবলয়ে, আর সারারাত্রির ইন্ধন জোগাবার মত কত যে কাঠখুটো গাদা করা হয়েছে বলয়ের অভ্যন্তরে, ভাবতেও অবাক্ লাগে। প্রচুর মেহনত করতে হয়েছে লোকগুলোকে এই বাবদেই। কিন্তু না করেও তো উপায় নেই। রাত্রির শতেক বিপদ থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ঐ আগুন। ঐ যে কানের কাছে মহারাজ ন্যুমার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেও লোকগুলো আধা-ঝলসানো মাংসের ঢ্যালা নির্বিকারভাবে চিবোচ্ছে, সে শুধু এই আগুন দেয়ালেরই ভরসায়।

মাটিতে দাঁড়িয়ে বাইরের কোন মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব যে ভিতরে কী হচ্ছে। টারজান বুঝতে এবং দেখতে পারছে শুধু এই কারণে যে সে মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই, উঠে বসেছে গাছের ডালে। অনেকখানি জায়গাই আগুনে ঘেরা। সেই জায়গাটার ভিতরে বড় বড় গাছও রয়েছে কয়েকটা। এ গাছ থেকে ও গাছে ডাল বেয়ে বেয়ে এগিয়ে এসে টারজান এখন ঠাঁই নিয়েছে অগ্নিবলয়ের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। আঁধার রাত, মেঘলা আকাশ, ঘন-পল্লবিত উঁচু ডালে তার অবস্থান, নীচের শিফটারা টারজানকে দেখে ফেলবে, এমন কোন আশঙ্কাই নেই। আগুন যেটা জ্বলছে, গাছ থেকে বেশ দূরে সেটা, আর তার আলো যদি-বা গাছের উপর পড়ছে, তা বাইরের দিকে।

যুদ্ধে নামবার আগে বিচক্ষণ সেনাপতিমাত্রেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেন রণক্ষেত্রটা। তারই বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে, তাদেরই যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করে রণকৌশল নির্ধারণ করেন তিনি। টারজানও এখন সেই কর্মে ব্যাপৃত। অগ্নিবেষ্টনীর মাঝখানটা পরখ করে করে দেখছে চোখা নজরে।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেকগুলো পাতালতার ঝোপড়ি। বৃষ্টির সময়ে এই-গুলিরই ভিতরে আশ্রয় নেবে শিফটারা। ছোট হলেও খুব খেলো নয় আশ্রয়গুলি। এত নীচু যে ঝড়ে তা ওলটাবে না। পাতার আচ্ছাদন এমন কৌশলে বুনোট করা যে যত জোরেই বৃষ্টি পড়ুক, ভিতরে জল পড়বে না। আর চাই কি! মেজেতে পুরু পাতার বিছানা, শিফটাদের পক্ষে রাজশয্যা।

একনজর দেখেই টারজানের মনে হল অন্ততঃ গোটা পঁচিশ ঝোপড়ি ওখানে রয়েছে এই রকম। এক একটাতে দু'জন করে মাথা গোঁজে যদি, দলের লোকবল জনা পঞ্চাশ অন্ততঃ হবে। অবশ্য পঞ্চাশ না হয়ে একশো হলেও তাতে টারজানের আসে-যায় না। সে তো আর মুখোমুখি লড়াই করবে না এদের সাথে! কেন করবে? এই তো দিব্য সুযোগ তার সামনে। কাঁধে রয়েছে তীরধনু। গাছের মাথায় অন্ধকার যতই থাকুক, শিফটাদের

খানাপিনার জায়গাটাতে আলোর অভাব নেই। অগ্নিবেষ্টনীর আলো তো আছেই, তা ছাড়াও মাংস ঝলসাবার জন্য ছোট একটা অগ্নিকুণ্ড ঐ খানেই বানিয়েছে ওরা।

হ্যাঁ, এক একটা তীরে এক একটা শত্রুনিপাত। ঠিক কতগুলো ডাকাত যমালয়ে পাঠালে দণ্ডটা সমুচিত হল বলে মনে করা যেতে পারবে, সেটা এখনও হিসাব করে দেখেনি টারজান। দেখা যাক, কতগুলো দস্যুকে মৃত্যুযাতনায় ছটফট করতে দেখার পরে হত্যায় অরুচি আসে তার।

ধনুকে প্রথমে তীর জুড়তে গিয়েই কিন্তু—

হঠাৎ একটা কাতরানি শোনা গেল। কে? এই নির্মম নরঘাতকেরা কেউ যাতনায় ককিয়ে উঠবে অমন করে, এ তো ধারণাই করা যায় না। তবে? তবে? আবার সেই গোঙানি। এবার টারজানের শ্যেনদৃষ্টিতে আবিষ্কৃত হল সেই আর্তনাদের উৎস। একটা মানুষকে হাত-পা বেঁধে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে এক গাছের গুঁড়িতে। লোকটার গায়ের রং ধবধবে সাদা! (ক্রমশঃ)

ডলার আসছে

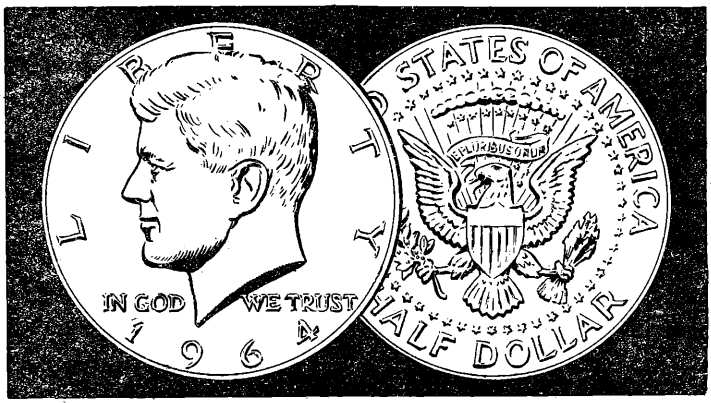

ছবিটা দেখে কারও আর বুঝতে বাকী থাকবে এটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত মুদ্রা হাফ ডলারের ছবি। এই ডলার-ঋণ নিক্সন সাহেব আটকে দেওয়াতে ভারতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। এখন এদেশের চিংড়ি মাছ ওদেশে রপ্তানী হচ্ছে। আর এদেশে চিংড়ির দাম বাড়ছে। দাম বাড়ুক তবু ডলার তো আসছে এতেই নেতারা খুশী।

পটুয়াটোলা লেনের সেই বিখ্যাত বাড়িতে যথানির্দিষ্ট সময়েই সুখেন, গগন আর হারাধন এসে দেখে, ঢেঁকিদার বাড়ির দরজা বন্ধ। তবে কি ঢেঁকিদা বাড়ি নেই? অবাক্ কাণ্ড, এরকম তো হয় না ঢেঁকিদার। কথা ছিল এদের সবাইকে নিয়ে সল্ট্ লেকের দিকে একটা জমি দেখতে যাবেন। 'হয়তো ঢেঁকিদা দোতলায় আছেন', বললে সুখেন, 'কড়া নেড়ে ডাকা যাক।'

কড়া নাড়া হোল। ঢেঁকিদার বদলে তাঁর মেয়ে গার্গী দরজা খুলে ওদের বৈঠক-খানায় বসতে বললে।

'বাবা কোথায়? তিনি আমাদের নিয়ে এক জায়গায় যাবেন কথা আছে', হারাধন জানায়।

'বাবা তো এই একটু আগে বেরিয়ে গেলেন সিনেমা দেখতে,—ঠিক ছ'টায় ফিরে আসবেন, বসতে বলে গেছেন। আপনাদের চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'—একসঙ্গে সব কিছু জানিয়ে দিয়ে গার্গী পাখাটা চালিয়ে দিয়ে অন্দরমহলে চলে যায়।

এদের তিনজন অবাক্ বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'এঁ্যা! ঢেঁকিদা শেষে সিনেমা গেলেন!' গগনের মন্তব্য।

'তাও আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে? কি তাজ্জব বাৎ'—সুখেনের হতাশা। হারাধন চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে, 'এখন সবে তিনটে পনেরো, আমরা সেই ছটা পর্যন্ত বসে কী যে করি! ঢেঁকিদা থাকলে তাঁর জীবনের দু-চারটে কাহিনী শোনা যেত।'

ওরা সবাই পাশাপাশি বসে সেদিনকার খবরের কাগজখানা দেখতে থাকে। রবি-বারের কাগজ। গগন-সুখেন সিনেমা পৃষ্ঠায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে হারাধন পাত্র-পাত্রীর খোঁজ করতে থাকে।

ইতিমধ্যে চা এসে যায়।

মৌজ করে সবে কাপে চুমুক লাগিয়েছে এহেন সময় ঢেঁকিদার প্রবেশ ও চাকরকে অর্ডার ঃ 'যা, আমার জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আয়। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

ঢেঁকিদার গলা শুনে সুখেনের চায়ের প্লেট ছলকে বেশ কিছুটা গগনের জামায় পড়লো। ততক্ষণে গগন জামা ঝাড়তে গিয়ে হারাধনের কাপটা উলটে দিয়েছে। তারপর তিনজনের যুগপৎ উষ্মা, বিরক্তিপ্রকাশ।

'আঃ, ঢেঁকিদা আপনি একটু সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকবেন তো—আমরা চমকে গেছি।'

'সিনেমা দেখতে গেছেন শুনলুম, এত তাড়াতাড়ি ফিরবেন আশাই করতে পারিনি।'

'টিকিট পাননি নিশ্চয়ই?'

ওদের সকলের জবাব এক কথায় দিলেন ঢেঁকিদা, 'ওহে, আমি কি আর আমাতে ছিলাম যে সাড়া দিয়ে ঢুকবো? টিকিট তো পেয়েছিলুম, হলেও ঢুকেছি,—কিন্তু সিনেমা দেখা আর হলো না। আমি ফেঁসে গেলুম। হ্যাঁ, তাও কিনা একটা সামান্য লোকের কাছে।'—ঢেঁকিদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

'ঢেঁকিদা ফেঁসে গেলেন? অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ব্যাপার।'—গগন বললে।

'হ্যাঁরে, শোন তবে ব্যাপারটা'। কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে ঢেঁকিদা শুরু করেন আজকের ঘটনাঃ

'সময়মত খেয়ে একটু গড়াতে গেলুম। জানি তোরা সবাই আসবি, তোদের নিয়ে সল্ট লেকের কাছে জমিটা দেখতে যাবো। দারুণ গরম, ঘুম এলো না চোখে, তাই সময় কাটাতে আজকের এই রোববারের কাগজটা ওল্টাতে-ওল্টাতে সিনেমার পাতায় এসে গেলুম। হঠাৎ দেখি, আমার পাড়ারই সিনেমা ঘরে আলফ্রেড হিচককের একটা বই এসেছে। এ বইটা আমি আগে দেখিনি, হিচকক্ কে জানিস তো?'

'হ্যাঁ ঢেঁকিদা, গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে ওঁর অনেক ছবি আছে। হিট্, সুপারহিট ছবি।'—সুখেনের মন্তব্য।

হারাধনও যোগ দেয়, 'দারুণ সাসপেন্স ছবি করেন ভদ্রলোক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধরার উপায় নেই কে খুনী।'

'ও, তোরা তো দেখছি আমার মতোই হিচকক্ভক্ত'—ঢেঁকিদা বলে চলেন, 'তা, এই হিচককের ছবি দেখার লোভেই তোদের সঙ্গে বাইরে যাবার প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে বেরিয়ে পড়লুম। ও হরি, হাউসে গিয়ে দেখি, 'হাউস ফুল' লটকানো। মনটা দারুণ খারাপ হয়ে গেলো। ফিরে আসছি, এমন সময়, একটা পুঁচকে ছোকরা আমার কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বললে—'বাবু, টিকিট নেবেন নাকি? তিন টাকা লাগবে।'

পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করতে গিয়ে দেখি,—ছোঁড়াটার হাতে যে টিকিট-খানা ধরা, তা হলো দু'টাকার। আমি বললাম—'ওখানা তো দু'টাকার টিকিট, আমাকে তিন টাকার টিকিট দাও একখানা।'

আমার কথা শোনেই না, বলবো কি তোদের, ছোঁড়াটা আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি একটা গণ্ডার বা জলহস্তী কিংবা,··· কিংবা ··

গগন পাদপূরণ করে তৎক্ষণাৎ, 'কিম্ভূতকিমাকার কিছু একটা।'

ঢেঁকিদা ঘাড় নাড়লেন। বলেন, 'হ্যাঁ হে, ছোঁড়াটা আমার দিকে তাকালো, সামনে থেকে আমাকে দেখলো, পাশ থেকে দেখলো, শেষে আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো, তারপর বললে—কদ্দিন শহরে এয়েছেন? বেলাক ছাড়া টিকিট পাওয়া যায় না, জানেন না? তায় আবার ইংরেজী বই।

কদ্দিন শহরে এয়েছেন?

শুনে তো আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে গেলো। আমি তোদের ঢেঁকিদা, তোরা কত ভয়-ভক্তি করিস, আমাকেই কিনা কোলকাতা শেখাচ্ছে? টিকিট ব্ল্যাক করতে এসেছে আমার কাছে? রাগে গর-গর করতে করতে ফিরছি, এমন সময় রাস্তার মোড়েই দেখা হয়ে গেল রমেন সমাদ্দারের সঙ্গে।—একটা জিপে চড়ে ডিউটিতে বেরিয়েছিল।'

হারাধন কি জিগ্যেস করতে সবে মুখ খুলেছে - ঢেঁকিদা থামিয়ে দিলেন, 'কী বলতে চাস্, বুঝেছি। আরে রমেন সমাদ্দার আমার বন্ধু, লালবাজারে পুলিসে চাকরি করে। সেই কতকাল দেখাসাক্ষাৎ নেই, আমাকে দেখতে পেয়েই না ঘ্যাঁচ করে জীপ থামিয়ে লাফিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরলো—ঢেঁকিদা, আপনি?

বললাম, হ্যাঁ ভাই, ভাল আছি। পর মুহূর্তে সামলে রমেনকে বললুম, না হে ভাল কী করে থাকবো তোমাদের জ্বালায়?

আমাদের জ্বালায়?—রমেনের প্রশ্ন।

বললুম, এই দেখ না, কতদিন পরে একটা ভাল ছবি এলো, আমার প্রিয় ডিরেক্টর হিচককের। টিকিট ব্ল্যাকে বিক্রী হচ্ছে, অথচ ওদিকে টাঙ্গানো 'হাউস ফুল'।

ব্ল্যাক ?—আপনার কাছে ব্ল্যাক চাইছে, আস্পর্ধা তো কম নয়। লোকটাকে দেখিয়ে দিতে পারেন ?

বললুম, লোকটা নয়, পুঁচকে একটা ছোঁড়া। আমাকে নিয়ে মন্তব্যও করেছে দু-একটা।

রমেনকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। দূর থেকে ছোঁড়াটাকে সনাক্ত করা মাত্রই তার কলার ধরে হ্যাঁচকাটান মেরে আমার পায়ের কাছে ফেলে দিলে রমেন। পরমুহূর্তেই সবুট এক লাথি।—ব্যাটা, আমার বন্ধুর কাছে ব্ল্যাক করছিস ? নে, ক্ষমা চেয়ে নে।

ততক্ষণে আশপাশের আরও দু-চারজন ছোঁড়া এসে গেছে। দেখলুম, সবাই রমেনকে চেনে। ভাগ-বাঁটোয়ারা আছে কিনা কে জানে! সকলেরই এক কারবার। ওদের দলের একজন মাতব্বরগোছের লোক, অনেকক্ষণ থেকেই আমার দিকে বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছিল। ভাবখানা এই, রমেন না থাকলে চিবিয়ে খাবে। হাতজোড় করে বললে বিনয়ের অবতারটি সেজে, আজ্ঞে, উনি আপনার জানা লোক বলে জানতুম না। ভুল হয়ে গেছে।

ছোঁড়াটাও ক্ষমা চাইলো পায়ে ধরে। আমি তখন তাকে দু'টাকা দিয়ে বললুম—ন্যায্য দামেই টিকিট দাও। তোমার ক্ষতি করতে চাই না।

আর ক্ষতি ? ছোঁড়াটার দাঁত কড়মড় আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি। শুধু পুলিসের ভয়েই কেঁচো সেজে আছে। টিকিটটা বের করে আমার হাতে দিলে।

অবশ্য রমেন এবং সেই মাতব্বর গোছের লোকটা চেয়েছিল আমাকে কিছুই দিতে হবে না টিকিটটার জন্যে, কিন্তু আমি তোদের ঢেঁকিদা, তা চাইবো কেন ? তাছাড়া ছোঁড়াটা যে লাথি খেয়েছে, তাইতেই তো শোধবোধ হয়ে গেছে।

যাবার আগে রমেন ওদের দলসুদ্ধ সবাইকে শাসিয়ে গেল—কেউ যেন এ নিয়ে আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার না করে। ওরা সবাই মাথা নেড়ে তা মেনে নেয়।

আমি গেটে টিকিট দেখিয়ে হলে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় সেই ব্ল্যাক-করা ছোঁড়াটা এলো। আমার পাশেই দাঁড়ালো। শুনতে পাচ্ছিলাম তার দাঁত কিড়মিড়ের শব্দ। রাগে, না ক্রিমির জন্য, কে জানে!

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার মুখে মৃদু হাসির ঝলক লক্ষ্য করলুম। ভয় হলো, শেষে ওরা দল বেঁধে হলের মধ্যে আমার ওপর কোন হামলা করে না বসে। তবে ভরসাও ছিল—সমাদ্দারের শাসানি। কোনো কিছু ঘটলেই রিপোর্ট করে দেবো।

আমি গিয়ে সিটে বসেছি, প্রথম বেল বেজেছে,—এমন সময় সেই ছোঁড়াটা এলো, হাতে কোকো-কোলার বোতল। এগিয়ে দিয়ে বললে—নিন্ স্যার। আমি খাওয়াচ্ছি।

দস্তুরমত ঘাবড়ে গে লু ম। কোকো-কোলায় কোন বিষটিষ মিশিয়ে রাখেনি তো! একেই তো ডিটেকটিভ বই দেখতে এসেছি, তায় আবার সেরা পরিচালক হিচকক্।— পাছে ঘাবড়ে গেছি ভাবে, তাই জয়-মা বলে কাঠিতে চুমুক দিলুম। নিতে না চাইলেও কোকো-কোলার দাম জোর করে হাতে গুঁজে দিই।

ঠিক আছে স্যার!—বশংবদ উত্তর। [পৃষ্ঠা ৩০০

হারাধন, গগন, সুখেন, তোরা ছোটবেলায় নিশ্চয়ই সেই মহৎ প্রতিশোধের গল্পটা পড়েছিস। সেই যে, গভীররাত্রে কে এক অতিথি এসেছে দ্বারে পথ হারিয়ে। গৃহস্বামী জেনে ফেলেছে—ঐ লোকটাই তার পুত্রকে হত্যা করেছে। কিন্তু গৃহস্বামী অতিথি সেবার বিন্দুমাত্র ত্রুটি না করে ভোর রাত্রে অতিথিকে জাগিয়ে, একটা দ্রুতগামী ঘোড়া দিয়ে বললে—আপনি রওনা দেবার ঠিক এক ঘণ্টা পরেই আমি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে রওনা হবো।—এই সময়ের মধ্যে আমার আস্তাবলের সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করুন।—পরে যদি কিছু ঘটে, আমি দায়ী হবো না। কি, মনে পড়ছে গল্পটা তোদের?'

'হ্যাঁ, ঢেঁকিদা'—ওদের তিনজনের সমস্বর প্রত্যুত্তর।

'ঠিক এই রকমই ঘটনা ঘটেছে আজ। শোন তারপর, একটু পরেই ঐ ছোঁড়াটা এক খিলি পান নিয়ে হাজির করলে। কিছুতেই দাম নিলে না, অধিকন্তু স্যার, স্যার করে সে কি খাতির। অত সবের মধ্যেও কিন্তু তার দাঁত কিড়মিড়ানি আর দাঁতের ফাঁকে বদমায়েশী মিশ্রিত হাসির কমতি ছিল না।

শেষে তৃতীয় বেল বাজলো।

ঘর অন্ধকার হয়ে সবে নিউজ রীল শুরু হয়েছে—এমন সময় কানের কাছে স্পষ্ট শুনতে পেলুম সেই ছোঁড়াটার কণ্ঠস্বর— স্যার, চা এনেছি। বললুম, এই তো সবে ঠাণ্ডা খেয়েছি, চা চাই না।

ঠিক আছে স্যার !—বশংবদ উত্তর।

অন্ধকারের মধ্যেও বেশ অনুভব করছি—ছোড়াটা আমার পাশ ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর মতলবটা কি ?—মনে ভয় জাগেনি বললে মিছে কথা বলা হবে।

নিউজ রীল শেষ হয়ে এবার আসল ছবি শুরু হলো।

সবে টাইটেল পড়তে শুরু করেছি, এমন সময় সেই বিনীত কণ্ঠস্বর : স্যার, এবার বই শুরু হলো। বেড়ে বইটা স্যার, ইংরেজী না জানলেও বোঝবার কোন অসুবিধা নেই। এ ছবিটা আমি, আগে যখন গ্লোবে চলেছিল, সেখানে দেখেছিলুম স্যার।

হুঁ—এছাড়া আর কোন কিছু না বলে ছবির জন্য উন্মুখ হই। আমার প্রিয় পরিচালকের বুদ্ধির খেল শুরু হতে আর দেরি নেই।

স্যার।

আঃ, ছোঁড়াটা কি নিশ্চিন্তে ছবি দেখতে দেবে না ? রাগতস্বরে বললুম—ওহে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন কষ্ট করে ? চা, কোকো-কোলা, পান—কোন কিছু চাই না, ভালভাবে ছবিটা দেখতে দাও।

নিশ্চয়ই দেখবেন স্যার, এই তো শুরু হলো ছবিটা। ঐ যে, ঐ যে ড্রাইভারটা, —যে এইমাত্র গাড়ি চালিয়ে গেল,—ছবিটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধরতেই পারবেন না, ঐ লোকটাই আসল খুনী। অথচ দেখতে কেমন ভেজা বেড়ালটি।

শোনামাত্রই আমি উঠে পড়লুম সিট ছেড়ে। ছবি দেখা আর হলো না। টিকিট ব্ল্যাক করতে না পারার চরম প্রতিশোধ নিয়ে ছোঁড়াটা ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে !!'

বাঁকুড়া জেলার শীতলা নিবাসী গঙ্গাধর মিশ্র তাঁর স্বর্গগত ছোটভাই মণিধর মিশ্রের পুণস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করিয়াছেন।

তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺মণিধর স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে শ্রাবণ ১৩৮০। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী আশ্বিন সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার ১৫·০০ টাকা ● দ্বিতীয় পুরস্কার ১০·০০ টাকা

"৺শুক্লা বল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

ভক্তের ভগবান

কল্যাণকুমার আচার্য

ভারত-ভ্রমণে বেরিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঋজু সুঠাম দেহ, তপ্ত কাঞ্চনের মতো গাত্রবর্ণ, উজ্জ্বল আয়তনেত্রে প্রতিভার দিব্য জ্যোতিঃ, হস্তে ধৃত দণ্ড কমণ্ডলু, পরিধানে সন্ন্যাসীর গৈরিক বাস। মনে তাঁর ইচ্ছা ভারতের প্রতিটি তীর্থস্থান দর্শন করবেন। প্রতিটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করবেন। অগণিত সাধারণ ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করবেন, ভারতবর্ষকে নতুন করে দেখবেন, শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েই নয় অন্তরের দৃষ্টি দিয়েও। পর্যটন করতে করতে তিনি এসে পৌঁছালেন বৃন্দাবনে, সেখান থেকে এলেন গিরি-গোবর্ধন পরিভ্রমণ করতে। এতদিন পথে তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল ভিক্ষা। এখানে এসে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন আর ভিক্ষা করবেন না। ভগবান যদি জোটান খাবেন নয়তো উপবাস করে সময় কাটাবেন। পর্যটন করতে করতে ক্রমেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, ক্ষুধায় তাঁর সমস্ত দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ল। তবু তিনি কারও কাছে কিছু চাইলেন না। ধীর ক্লান্ত চরণে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

এমনি ভাবে কয়েকদিন কেটে যাবার পর—একদিন সহসা কে একজন ডাকল তাঁকে। তিনি পিছন ফিরে দেখলেন এক ব্যক্তি কিছু খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি সেগুলি তাঁর পদতলে নামিয়ে রেখে বলল—"আমার প্রতি কাল স্বপ্নাদেশ হয়েছে, আপনি আজ কয়েকদিন উপবাসে আছেন, কিষণজী তাই আপনার কাছে কিছু খাবার পাঠাতে বললেন, তাই আপনার জন্য এগুলি এনেছি, দয়া করে খেয়ে নিন।"

পরম করুণাময়ের করুণা দেখে স্বামিজীর চোখ জলে ভরে গেল। পরম আনন্দে তিনি সেই সব খাদ্য খেয়ে ক্ষুধা দূর করলেন। এরপর তিনি এলেন রাধাকুণ্ডে। কুণ্ডের জল পরম পবিত্র। প্রতিদিন বহু পুণ্যকামী নরনারী পুণ্য অর্জনের আশায় এখানে আসে স্নান করে। স্বামিজীও ঐ কুণ্ডে স্নান করতে মনস্থ করলেন, কিন্তু স্নান করবেন কিভাবে? পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর একমাত্র কৌপিন সম্বল। স্থানটি নির্জন দেখে তিনি নগ্ন হয়ে প্রথমে কৌপিনখানি কেচে নিয়ে ডাঙ্গায় শুকোতে দিলেন। তারপর স্নান করতে নামলেন। কিন্তু স্নান করে এসে তিনি আর কৌপিনখানি সেখানে দেখতে পেলেন না। এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করতেই তাঁর নজরে পড়ল এক বাঁদর সেটিকে গাছের উপর নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে। মুহূর্তে ক্ষোভে পূর্ণ হয়ে গেল স্বামিজীর অন্তর।

স্বামিজী

ভগবানকে উদ্দেশ্য করেই যেন বলে উঠলেন তিনি "বৈরাগীর একমাত্র কৌপিন তাও কেড়ে নিলে। বেশ লোকালয়ে আর ফিরবো না, এই বনেই চললাম। যতদিন না বস্ত্র জুটিয়ে দাও ততদিন এই বনেই বাস করবো।" এই বলে অভিমানভরে প্রবেশ করলেন বনের অভ্যন্তরে।

হঠাৎ স্বামিজীর কানে গেল কার যেন কণ্ঠস্বর। গাছের আড়াল হতে উঁকি দিয়ে তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি কিছু খাদ্য ও একটি গেরুয়া বসন নিয়ে তাঁকেই ডাকছে এবং সেগুলি তাঁকে গ্রহণ করতে বলছে। গভীর বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন তিনি। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো তাঁর। কেমন করে এ বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভব হল ভাববারও অবসর পেলেন না তিনি। তাড়াতাড়ি গেরুয়া বসনখানি গ্রহণ করে লজ্জা নিবারণ করলেন। পরে খাদ্যগুলিও গ্রহণ করলেন। এদিকে লোকটি তাঁকে খাদ্য ও বস্ত্র দিয়েই অদৃশ্য হল ঘন বনান্তরালে। পিছু পিছু গিয়েও স্বামিজী তার দেখা পেলেন না। ডেকেও সাড়া পেলেন না তার।

এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল স্বামিজীর সমস্ত হৃদয়। দুচোখ ছাপিয়ে নামল অশ্রুধারা। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন তিনি, "কে বলে তুমি নেই, তুমি বধির, তুমি পাষাণ, ভগবান সত্যই তুমি আছো, কোন মূর্খ তোমায় অবিশ্বাস করে।" মনের মধ্যে এক দিব্য অনুভূতি লাভ করে তিনি ফিরে চললেন নিজ গন্তব্যস্থানে।

"৺শুক্লা বল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

অবতার

শ্রীনির্মলেন্দু নাথ

সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল নরেনের। ঠাকুর বলেছেন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখা করে আসতে।

নরেন তাঁর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে না। সেদিন গিয়েছিল গাড়িতে, আজ চলেছে হেঁটে। সেদিনের মতো ছোট্ট তক্তপোশটিতে বসে আছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। যেন কার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্তব্ধ হয়ে। ঘরে অন্য লোকজন নেই।

নরেন এসে দাঁড়াল সামনে।

—'ওরে এসেছিস?' শিশুর মতো আহ্লাদে ফেটে পড়লেন রামকৃষ্ণ। 'তোর জন্যে বসে আছি কখন থেকে। আহা, মুখখানি শুকিয়ে গেছে দেখছি। কিছু খাবি?'

নরেন একটু দূরে বসল কুণ্ঠিত হয়ে। একটু কেমন ভয় ভয় করতে লাগল।

ঠিকঠাক কিছু একটা ভেবে নেবার আগেই তার গায়ের উপর ডান পা তুলে দিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। মুহূর্তে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। মনে হোল দেয়াল-ছাদ সব যেন উড়ে গিয়েছে, ঘরে লোক নেই, জিনিস নেই, শুধু আকাশময় নিঃসীম শুভ্রতা। বিশ্বময় একটিমাত্র চেতনার মধ্যে মিশে যাচ্ছে এই শরীরাবদ্ধ সংকীর্ণ চেতনা। আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল নরেন—'ঠাকুর, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে মা আছেন, বাবা আছেন—'

নরেনের আর্তস্বর কি রকম যেন বাজল ঠাকুরের বুকের মধ্যে। ঠাকুর পা সরিয়ে নিলেন নরেনের গা থেকে। স্নেহসুধাসিঞ্চিত কোমল হাতখানি বুকের উপর বুলিয়ে দিতে লাগলেন তিনি।

নিমেষে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। ছাদ, দেয়াল ঠিক ঠিক এসে বসল যে যার জায়গায়। জিনিসপত্র ফিরে পেল তাদের আগেকার অস্তিত্ব। গাছপালা, নদী, মাঠ-ঘাট সব আবার চিত্রার্পিত হোল। ফিরে এল আবার সহজের সুষমা।

তবে এটা কী হয়ে গেল পলকের মধ্যে? ভেলকি? ভোজবাজি? তাছাড়া আবার কি! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উড়ে গেল চোখের সামনে? সাধু নিশ্চয়ই কোন ম্যাজিক জানে।

আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি এতদিন। সেদিন তাই সরাসরি প্রশ্ন করে বসল বিলে—'এত যে মা—মা করো মাকে দেখতে পাও তুমি?'

'দেখতে পাই কি রে!' অগাধ সারল্যে ঠাকুর হেসে উঠলেন। 'তার সঙ্গে বসে কথা কই, খাই, মায়ের পাশটিতে ছোট্টটি হয়ে ঘুমুই—'

নরেনও হেসে উঠল। হেসে উঠল বিদ্রূপে। এ কখনো সম্ভব হতে পারে?

একটা পাথরের পুতুল, ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, বোবা অন্ধ একটা জড়পিণ্ড, সে নড়েচড়ে হাঁটে চলে এ নিছক আজগুবি। শুধু তাই নয়, কথা কয়, হাসে, এমনকি টাকরায় জিভের শব্দ করে খায় নাকি তাড়িয়ে তাড়িয়ে। গাঁজাখুরি আর কাকে বলে? আর, মায়ের ওই তো একটুখানি খাট, তার মধ্যে জড়সড় হয়ে ঠাকুর শোন কি করে?

'ও তো একটা পাষাণের পুত্তলী—স্থবির জড়পিণ্ড।' নরেন বলে।

'জড়পিণ্ড!' ঠাকুরের বিন্দুবিসর্গ রাগ নেই।

'ওরে জড় তো চৈতন্যের ছদ্মবেশ। আর জীব তো ঈশ্বরের প্রতিরূপ।'

'বললেই হোল? সব ঈশ্বর?' নরেনের কণ্ঠে বিস্ময়।

'সমস্ত। ধূলিকণা থেকে নক্ষত্রকণা।' ঠাকুর বললেন।

'ঘটি, বাটি, থালা, গ্লাস—সব?'

ঠাকুর স্নিগ্ধহাস্যে অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয়। ঘটি, বাটি, থালা গ্লাস—সমস্ত।'

নরেন ভাবে, হয় এ লোক জেগে জেগে ঘুমোয়, নয়তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও দেখে। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তার চেয়ে হাজরার সঙ্গে দুটো কথা কই।

পুরো নাম প্রতাপ হাজরা। বাড়িঘর ছেড়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে বসেছে, মতলব ঠাকুরকে ধরে যদি কিছু সুরাহা হয়।

বারান্দায় বসে হাজরা তামাক সাজছে। পাশে এসে বসল নরেন। টিকে ধরিয়ে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিল নরেনের দিকে। টানতে লাগল নরেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'শুনেছেন, ঠাকুর কি অসম্ভব কথা বলেছে?'

'কী বলেছে?' ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করে প্রতাপ। 'বলছে ঘটি, বাটি, থালা, গ্লাস সব নাকি ঈশ্বর। ইট, কাঠ, লোহা-লক্কর—সমস্ত।'

'পাগলে কি না বলে!' হুঁকোর জন্য হাত বাড়াল হাজরা।

'শুধু তাই নয়। আমি আপনি—রাস্তার ঐ লোক, নৌকোর ঐ মাঝি—সব নাকি ঈশ্বর।'

হো-হো করে হেসে উঠল প্রতাপ হাজরা।

সেই ব্যঙ্গের হাসিতে যোগ দিল নরেন।

ঠাকুর ঘরে ছিলেন, সেই হাসি শুনে নিমেষে একটি বালকের মতো হয়ে গেলেন। পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

'কি বলছিস রে নরেন?' হাসতে হাসতে কাছে এসে নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন। ছুঁয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সর্ব অঙ্গে শিউরে উঠল নরেন, নিগূঢ়তম শিরাতন্ত্রীতে যেন চোখের সম্মুখ থেকে একটা পর্দা সরে গেল। চেয়ে দেখল নরেন, সমস্ত কিছু প্রাণময়, গতিময়, জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। দেখল নিজেকে, দেখল ঈশ্বরকে। দেখল ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। ঘটি, বাটি, থালা, গ্লাস, হুঁকো, কলকে, প্রতাপ হাজরা—সব ঈশ্বর। মাঝিমাল্লা, মুটেমজুর, কামার, ছুতোর, জেলে, জোলা সব ঈশ্বর। এ কি চোখে ঘোর লাগল নাকি? চোখ বুজল নরেন। অন্ধকারেও সে-ই চৈতন্যদ্যুতি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল নরেন। বাড়িতে এসেও সেই ভাব। ইট, কাঠ, কড়ি-বরগা, দরজা-জানলা কিছুই আর জড়বস্তু নয়, সব প্রাণবন্ত। খাট, চৌকি, চেয়ার-টেবিল, বিছানা-বালিশ—সমস্ত। সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর বসে আছেন—নড়ছেন, ফিরছেন।

স্বামিজী

মা খাবার দিয়ে গেলেন। নরেন খেতে বসল। আশ্চর্য, ভাত, ডাল, তরিতরকারির মধ্যেও ঈশ্বর বসে আছেন।

'কি রে বসে আছিস কেন? খা।' মা তাড়া দিলেন।

কে পরিবেশন করছে? কে খাচ্ছে? কাকেই বা খাওয়াচ্ছে? দাতা ঈশ্বর, ভোক্তা ঈশ্বর, আহার্যও ঈশ্বর। বিরাট একটা অনুভূতির দেশে চলে এল নরেন।

পরদিন সকালে রাস্তায় নেমেও সেই দশা। ঐ যে গ্যাসপোস্ট দাঁড়িয়ে আছে ও কি শুধু গ্যাসপোস্ট? ও তো ঈশ্বর, ও তো আমি। ঐ যে গাড়ি আসছে ছুটে, আমাকে, ঈশ্বরকে জড়িয়ে ধরতে।

বিকেলে নরেন বেড়াতে এসেছে হেদোয়। লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকছে নরেন। আর বলছে, 'বল তুই কে? তুই কি ঈশ্বর, তুই কি আমি?'

আগুন থামাতে ও জ্বালাতে অগ্নিবাহিনী

আগুন লাগিয়ে যাতে জঙ্গলের ক্ষতি করতে সাধারণ লোকে না পারে তাই যুক্তরাষ্ট্রে দাবানল প্রতিরোধ-বাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সিকুয়া গাছের জঙ্গলে স্বাভাবিক দাবাগ্নি না ঘটায় এক রকম আগাছায় সারা জঙ্গল পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই আগাছার নীচে সিকুয়া গাছের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না বলে এখানে অগ্নিবাহিনী নিয়োগ করে আগাছা পোড়াতে হয়। সিকুয়া গাছ দৈত্যের মত বিরাট উঁচু হয়।

তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়

ছবিটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটি একজন চেনা ব্যক্তি। জন্মেছিলেন মুসুরি প্রদেশের লামার অঞ্চলে এক খামারে। কিছুদিন খামার পরিচালনা করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গোলন্দাজ সৈনিক হয়ে যোগ দেন। যুদ্ধাবসানে আইন পড়ে বিচারক হলেন। তারপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাই খেটে খাওয়া ক্ষেতের মানুষকে তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়।

ইচ্ছার ফল

রিপ্ন

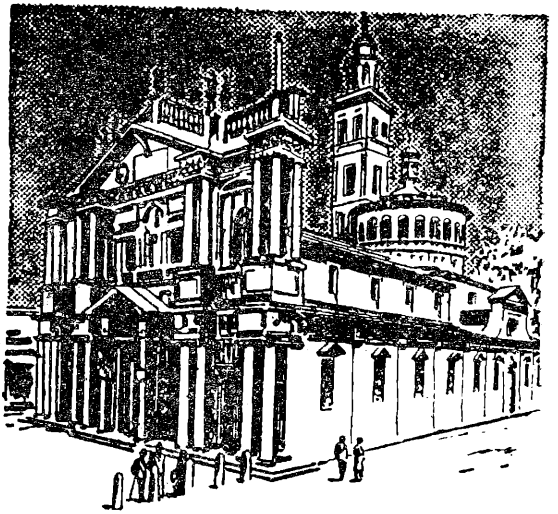

কথাটা সত্যি।

সাধারণ লোকে তা বিশ্বাস করে না।

অথচ বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বলেছিলেন তাঁর গুরুভাইদের উদ্দেশ করে। কিছু করতে হলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, চাই তীব্র সংকল্প। সত্যি তাই। তা না হলে একটা ভিখিরী শুধু ইচ্ছার জোরে একটা বিরাট গির্জা তৈরি করতে পারে।

ঘটনাটা ঘটেছিল ইটালী দেশে। সেখানে সারোনো বলে একটা জায়গা আছে। সারোনায় এক ভিখিরী বাস করত। নাম তার পেড্রেটো। তাকে সাহায্য করবার কেউ ছিল না। কিছু করবারও কোন ক্ষমতা ছিল না তার, একেবারে সব কাজের বার।

একবার পেড্রো অসুস্থ হয়ে পড়ে। রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে ভগবানকে ডাকতে থাকে। প্রার্থনা করতে করতে তার শরীর সুস্থ হয়ে ওঠে ১৪৬০ সালে। রোগ থেকে ভাল হয়ে সে প্রতিজ্ঞা করে যে সে ভগবানের জন্যে একটা মন্দির করে দেবে।

পেড্রোর যে একটা কপর্দকও ছিল না সেটা তার প্রতিজ্ঞা করার সময় খেয়াল হয়নি। সে তেড়ে ফুঁড়ে লেগে গেল বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে। যাত্রীদের কাছ থেকে যা পেত সবটাই সে জমিয়ে রাখত। নিজের জন্য একটা পয়সাও খরচ করত না। এইভাবে দীর্ঘ আটত্রিশ বছর একদিনও কামাই না করে সে ভিক্ষা করে। তারপর একদিন তার জমান টাকা হিসাব করে দেখে মন্দির তৈরি করবার জন্য যথেষ্ট টাকা জমে গেছে। শুরু করে দিল মন্দির তৈরীর কাজ ১৪৯৮ সালে। কিন্তু কাজটা নিজে হাতে শেষ করে যেতে পারল না। কাজটা শেষ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়। পেড্রোর মৃত্যু হলেও তার ইচ্ছার মৃত্যু হয়নি! তিরাশি বছর পরে মন্দির নির্মাণ শেষ হল। তারপর তা ভগবানের নামে উৎসর্গ করা হয়। এতেই প্রমাণ হয়, কাজের পেছনে সংকল্প থাকলে কাজটা পূর্ণ হয়।

———

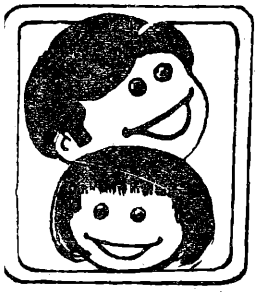

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১। দেবের বাহন আমি আমার মাথায় পা?
ওরে পামর দুরাচার নরকে তুই যা!

—উত্তমকুমার বটব্যাল, মালিয়াড়া।

২। কথাটার গোড়া ধরি লিখি প্রথম, আর—
কাজের শুরুর সাথে এল তা, শহরের সার।

—নীলাদ্রিকান্তি ব্যানার্জী, কাঁটালগুড়ি।

৩। অমল এক বালতি জল ও ছোট বড় দুটো মগ এনে তার বন্ধুদের বলল,—বড় মগটায় পাঁচ সের জল ধরে ও ছোট মগটায় তিন সের জল ধরে। এই বালতিতে যা জল আছে, তার থেকে প্রতি মগে এক সের করে জল তুলে নিতে হবে—তোরা পারবি কেউ?

বন্ধুরা সকলে মিলে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। তোমরা কি কেউ অমলের বন্ধুদের সাহায্য করতে পার?

—পার্থ সরকার, উত্তরপাড়া।

গত চৈত্র সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। মোট ৪২ রকম উপায়ে সাজান যায়।

২। একশো থেকে ১ বাদ দিলে ৯৯ অর্থাৎ নয় নয়। নয় নয় এর শেষ অক্ষর বাদ দিলে হয় নয়ন।

গত চৈত্র সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—রীণা চট্টোপাধ্যায় তালতলা এভেনিউ; মা বাবা, নীলাঞ্জন ও তথাগত মুখোপাধ্যায়—? রঞ্জন তালুকদার—শ্যামবাজার স্ট্রীট।

হাওড়া—খোকা, সুশান্ত, মিঠু, নূপুর ও কাল্টু—কাসুন্দিয়া রোড।

মুর্শিদাবাদ—সন্তোষ, বনানী ও কনকলতা—বহরমপুর।

পশ্চিম দিনাজপুর—সুব্রত রায়চৌধুরী—রায়গঞ্জ।

বলুন তো কার মা খেতে দেন ইনক্রিমিন*?

ড্রপস—২ মাস থেকে
২ বছরের শিশুদের জন্যে
সিরাপ—১৪ বছর অবধি
বয়েসের বাচ্চাদের জন্যে

বড়ো হওয়ার বড়ো সহায়!
এই তো বাড়ন্ত বয়েসের
ছেলেমেয়েদের জন্যে সেরা টনিক!

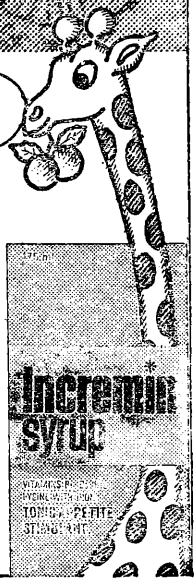

ইনক্রিমিন* টনিক

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে।

ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Lederle

সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ

* আমেরিকান সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

SISTA'S-INC-1011 BEN

সর্বজন প্রশংসিত এবং বহুল প্রচারিত
সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত
সরল বাঙ্গালা অভিধান **মূল্য ২৫·০০**
ডাকমাসুল সহ টা. ৩০·০০ স্থলে টা. ২৫·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Century Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 12·00

Century Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs, 12·00

ডাকমাসুল সহ টা. ১৫·০০ স্থলে মাত্র টা. ১২·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Pocket Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 6·50

Pocket Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 6·50

ডাকমাসুল সহ টা. ৮·০০ স্থলে মাত্র টা. ৭·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

NEW BENGAL PRESS (Private) **Ltd.**, 68, College Street, Calcutta-12

দেব সাহিত্য কুটীরে
= বাহির হইল =
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত—সেই বহু পুরাতন—
ছেলেমেয়েদের মনমাতানো—

❋ টুনটুনির বই ❋

নব কলেবরে বাহির হইল।
পাতায় পাতায় ছবি, তিন রংয়ের প্রচ্ছদপট,
ডিমাই সাইজ।

দাম—২·৫০ পয়সা

ছেলেমেয়েদের কাছে কয়েকখানি লোভনীয় গল্পের বই

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
অজানার উজানে— ১·৫০
[দুই কিশোরের অদ্ভুত অ্যাড্‌ভেঞ্চার-কাহিনী]

রমেশচন্দ্র দাসের
অজ্ঞাত দেশ— ১·৫০
[পলটুর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প]

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শিকারের গল্প— ১·৫০
[আসামের জঙ্গলে শিকার-কাহিনীর]

শ্রীসুকুমার দে সরকারের
হানাবাড়ী— ১·৫০
[পোড়ো বাড়ীর ভৌতিক রহস্য]

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহার
মা ভাই বোন— ১·৫০
[ডাকাত দলের লোমহর্ষক কাহিনী]

শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়ের
বাহাদুর— ১·২৫
[কুমীরের সাথে বাহাদুরের দুঃসাহসিক লড়াই]

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কম্যাণ্ডার কবুতর— ২·০০
[বিগত যুদ্ধে পায়রা কিভাবে এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে সংবাদ আদান-প্রদান করেছিল···চাঞ্চল্যকর কাহিনী]

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের
সমুদ্রের রহস্য— ২·০০
[সমুদ্রের তলায় যে কত রহস্য লুকানো আছে তার এক চাঞ্চল্যকর কাহিনী]

গদাধর নিয়োগীর
মিনু ও কাপালিক— ২·০০
[সেকালে কাপালিকের নরবলির এক লোমহর্ষক কাহিনী]

যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শতবর্ষ পরে— ২·০০
[ইংরেজের অত্যাচার কাহিনী]

শ্রীমনীগোপাল চক্রবর্ত্তীর
আকাশ গঙ্গা— ২·০০
[ভারতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থের ভ্রমণ-কাহিনী]

সুষমা সেনের
ঈশ্বরের মৃত্যু— ১·৫০
[পরমেশগঞ্জের ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনী]

দেব সাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯

যে সব বই হাতে পেলে ছেলেমেয়েরা আর কিছু চায় না, তেমনি কয়েকখানি বই !!!

অ্যাড্‌ভেঞ্চার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সূর্যনগরীর গুপ্তধন ... ১·৫০
আবার যখের ধন ... ২·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নিশির ডাক ... ১·২৫
বিষের তীর ... ১·২৫

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রত্নদ্বীপের বিভীষিকা ১·৫০
সাহারার আতঙ্ক ... ১·২৫

সুবোধচন্দ্র মজুমদার

খুনে বৈজ্ঞানিক ... ১·২৫

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শয়তানের ঘাঁটি ... ১·২৫

দৃষ্টিহীন

মরণদূতের আনাগোনা ২·৫০

রূপকথা

ঠাকুরমার ঝুলি ... ৪·০০
ঠাকুরমার গল্প ... ১·২৫

হাসির গল্প

উদোর পিণ্ডি
বুধোর ঘাড়ে ... ১·৫০
হাসির এ্যাটম বোম ... ৪·০০

ভৌতিক গল্প

ভূত-পেত্নী দত্যি-দানা ৪·০০
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ৩·০০
রাক্ষস-খোক্কস ... ৪·০০

শিশু উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দুই ভাই ... ২·০০

অখিল নিয়োগী

ঘূর্ণিপাকে ... ১·২৫

৪১খানি পূজা বার্ষিকী

প্রত্যেকখানি চার টাকা

ছোটদের চয়নিকা ঝলমল
ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন
আজব বই শিশু-গল্পিকা
সোনার কাঠি
যাদুঘর চিত্রদীপ মায়ামুকুর
সোনালী ফসল
মধুমেলা রূপরেখা বর্ষ-মঙ্গল
আলপনা রাঙারাখী
নবারুণ অঞ্জলি আবাহন
উদয়ন অভিষেক পরশমণি
বসুধারা ইন্দ্রধনু দেবালয়
জয়যাত্রা নব পত্রিকা
ছোটদের মাধুকরী

প্রত্যেকখানি পাঁচ টাকা

অপরাজিতা দেব দেউল
অপরূপা শারদীয়া শ্যামলী
অলকনন্দা উত্তরায়ণ

প্রত্যেকখানি ছয় টাকা

নীহারিকা অরুণাচল
বেণুবীণা ইন্দ্রনীল শুকসারী
মণিহার ... ৮·০০
উদ্বোধন ... ৮·০০

এমনি আরও অসংখ্য বই

চিঠি লিখলে বিনা মূল্যে পুস্তক-তালিকা পাঠান হয়। B

দেব সাহিত্য কুটীর ০০ ২১ ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা—৯